প্রাথমিক বিজ্ঞান

চতুর্থ শ্রেণি

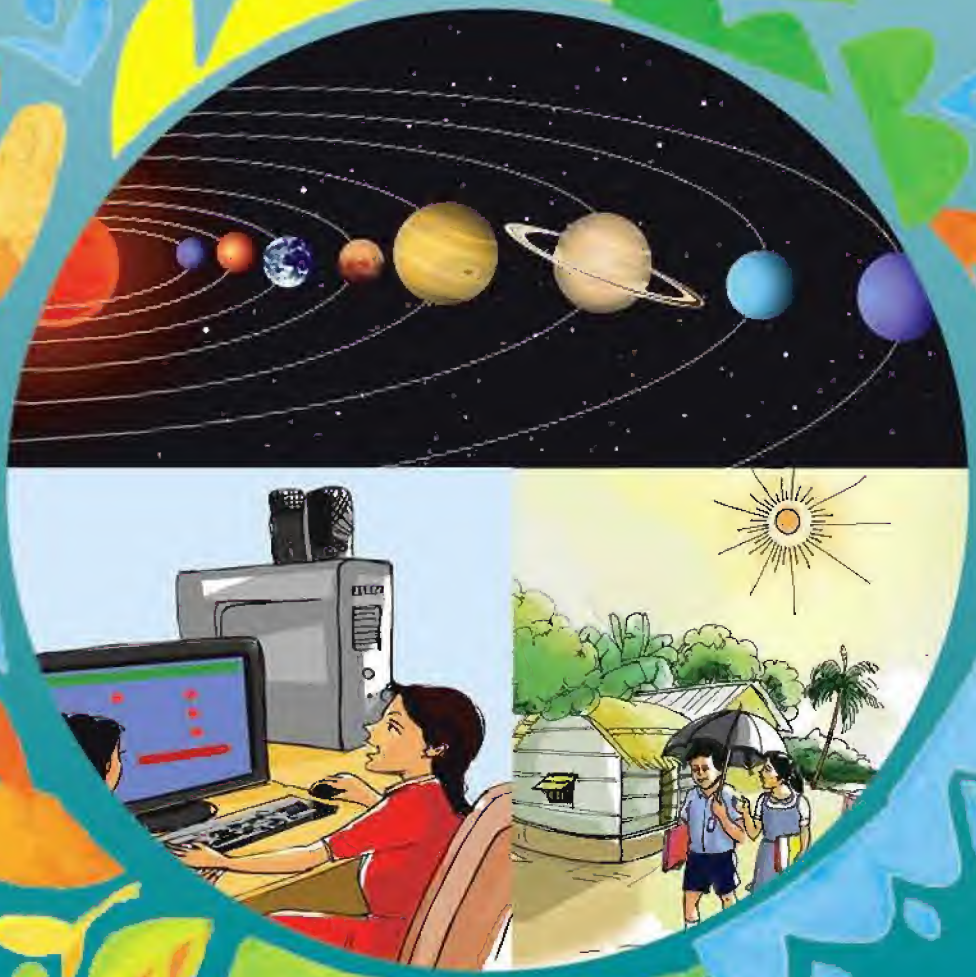

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

প্রাথমিক বিজ্ঞান

চতুর্থ শ্রেণি

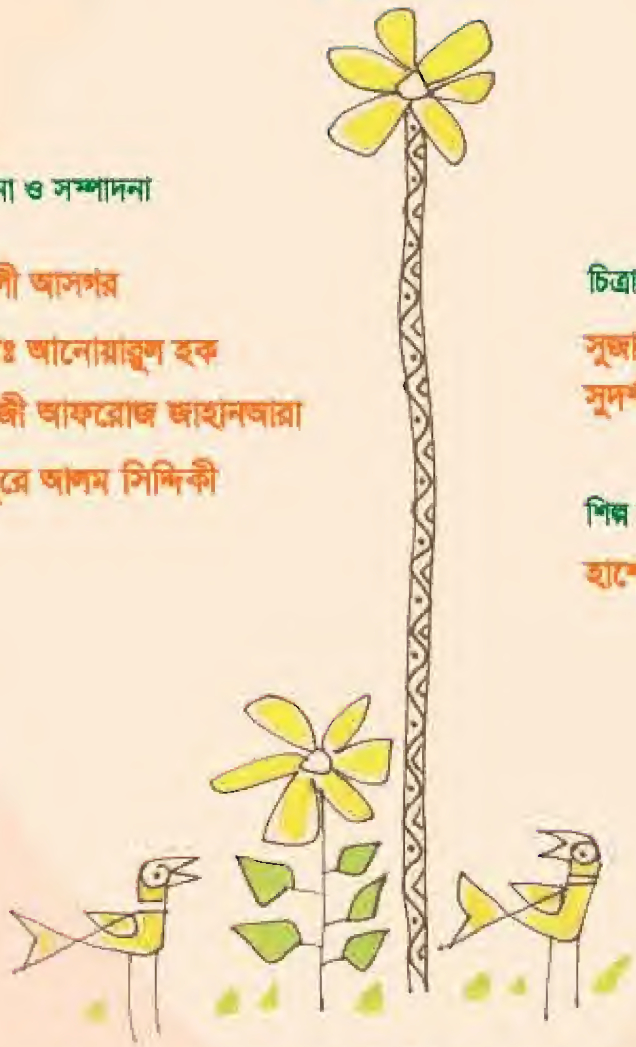

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর আলী আসগর

প্রফেসর মোঃ আনোয়ারুল হক

প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

চিত্রাঙ্কন

সুজাউল আবেদীন কিষান

সুদর্শন বাছার

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
খন্দকার মোঃ মঞ্জুরুল আলম

গ্রাফিক্স
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই বিপুল ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এ নির্ধারিত হয় শিশু–শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিশুদের চারপাশে রয়েছে নানা বস্তু। প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ঘটছে নানা ঘটনা। পানির গ্লাস, বায়ুভরা বেলুন, গাছ, ফুল, ভোরের সূর্য, রাতের তারাভরা আকাশ– সবই গভীর আনন্দের ও অপার বিস্ময়ের। শিক্ষার্থীর ভালোলাগার এই অনুভূতি তার দেখা নানা বস্তু ও ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন তাকে অনুসন্ধিৎসু ও অনুসন্ধানী করে তোলে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এই উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যে, বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য কিছু তথ্য জানা ও মুখস্থ করা নয়। সম্পর্কহীনভাবে নিরস তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে তথ্যের পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার দুটি মূলধারা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন, অন্যটি হলো প্রশ্ন উত্থাপন, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও তত্ত্বের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ভিতর দিয়ে অংশগ্রহণ। এই দুটি উপাদান পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আর একটি লক্ষ্য।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	জীব ও পরিবেশ	১
২	উদ্ভিদ ও প্রাণী	৮
৩	মাটি	১৫
৪	খাদ্য	২১
৫	স্বাস্থ্যবিধি	২৮
৬	পদার্থ	৩৫
৭	প্রাকৃতিক সম্পদ	৪০
৮	মহাবিশ্ব	৪৯
৯	আমাদের জীবনে প্রযুক্তি	৫৫
১০	আবহাওয়া ও জলবায়ু	৬১
১১	জীবনের নিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা	৬৯
১২	আমাদের জীবনে তথ্য	৮১
১৩	জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	৮৯

অধ্যায়–১

জীব ও পরিবেশ

তোমরা জেনেছ, জীবের চারপাশের সবকিছুই তার পরিবেশ। প্রত্যেক জীব একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বাস করে।

কোনো কোনো জীবের প্রয়োজন ছায়াযুক্ত পরিবেশ, আবার কারো প্রয়োজন এমন পরিবেশ যেখানে আলো আছে। এ ছাড়াও রয়েছে জলজ পরিবেশ, সমতল ভূমির পরিবেশ, বনজঙ্গলের পরিবেশ ইত্যাদি। তোমরা লক্ষ করলে দেখবে এসব বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। এরা পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এছাড়াও বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য উপাদানও প্রয়োজন।

বেঁচে থাকার জন্য জীবের কী কী প্রয়োজন?

বিভিন্ন জীব কীভাবে বেঁচে থাকে তা তোমার নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে ছক দুটো খাতায় তুলে পূরণ কর।

বেঁচে থাকার জন্য তোমার কী কী প্রয়োজন?

-
-
-

বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের কী কী প্রয়োজন?

-
-
-

তোমরা জেনে রাখ

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, পানি, বায়ু, আবাসস্থল এবং সহনীয় তাপমাত্রা। অন্যান্য জীবেরও বেঁচে থাকার জন্য প্রায় একই ধরনের উপাদান প্রয়োজন। উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পুষ্টি, সূর্যের আলো, পানি, বায়ু, আবাসস্থল এবং অনুকূল তাপমাত্রা।

জীবের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানসমূহ

খাদ্য

উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যাবহার করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। প্রাণী উদ্ভিদের মতো নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল।

পানি

ভেবে দেখতো, তুমি দিনে কত গ্লাস পানি পান কর? পানি ছাড়া কি আমরা বাঁচতে পারি? আবার অনেক প্রাণী পানিতে বাস করে। খাদ্য তৈরি ও বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের পানি প্রয়োজন। উদ্ভিদ যে পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না তা দেখার জন্য নিচের পরীক্ষাটি কর।

পানি দেওয়া গাছ

দুটো টবে একই রকমের দুটো গাছ লাগাও। একটিতে নিয়মিত পানি দাও। অপরটিতে পানি দিবে না। দেখ কয়েকদিন পর কী ঘটে?

লক্ষ্য করে দেখ, যেটিতে পানি দেওয়া হয় নাই সেটি মরে গিয়েছে।

পানি না দেওয়া গাছ

বায়ু

অল্প সময়ের জন্য তোমার নাক ও মুখ হাত দিয়ে চেপে বন্ধ রাখ। কেমন লাগছে? দম বন্ধ হয়ে আসছে, তাই না? বায়ু ছাড়া আমরা কেউ বাঁচতে পারি না। কারণ, শ্বাসকার্যের মাধ্যমে বায়ু থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। মানুষ

ছাড়াও অন্যান্য সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। এমনকি পানিতে যে সকল প্রাণী থাকে তাদেরও বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। যেমন– মাছ তার ফুলকার সাহায্যে পানিতে মিশে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে। বেঁচে থাকার জন্য অধিকাংশ প্রাণী বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে। এই কার্বন ডাই অক্সাইড আবার উদ্ভিদ গ্রহণ করে।

শ্বাস বন্ধ রাখার পরীক্ষা

আলো ও অনুকূল তাপমাত্রা

নিচের পরীক্ষাটি করে দেখ। তোমার স্কুল বা বাড়ির আশপাশে একটি খোলা মাঠে যেখানে ঘাস জন্মেছে সেরকম একটি স্থান নির্বাচন কর। একটি ইট ঘাসের উপর কয়েকদিন রেখে দাও। কয়েকদিন পরে ইট সরিয়ে দেখ। কী ঘটেছে? যে স্থানে ইট ছিল সে স্থানের ঘাসের রং কি পরিবর্তন হয়েছে? কেন হয়েছে?

ইট চাপা দেয়া জায়গায় ঘাস সাদা হয়ে আছে

সুতরাং আলোর প্রয়োজনীয়তা কী তা তোমরা বুঝতে পারছ। সকল জীবের বেঁচে থাকার জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রয়োজন। তাপমাত্রা যদি অনেক বেশি বা ঠান্ডা হয় তাহলে অনেক জীব বেঁচে থাকতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে নির্দিষ্ট আশ্রয় ও আবাসস্থল প্রয়োজন।

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল?

উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরকে ছাড়া পরিবেশে বাঁচতে পারে না।তোমরা কাছাকাছি কোন বাগান বা ক্ষেতে যাও। দেখ, উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর কীভাবে নির্ভরশীল।

এবারে ভেবে দেখতো, মানুষ কীভাবে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল? তুমি কীভাবে উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল?

নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ কর:

ক্রমিক	জীবের নাম	কীভাবে অন্য কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপর নির্ভরশীল
১	মাছ	
২	পাখি	
৩	গোরু	
৪	মানুষ	

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য যে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা উদ্ভিদ থেকেই আসে। এই উদ্ভিদ থেকেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়। প্রাণীর মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়। যেমন– মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। বড় উদ্ভিদ আবার ছোট উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল।

প্রজাপতির মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে দেখেছ বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন উদ্ভিদের ডালে বাসা বাঁধে। এভাবেই উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। মানুষ কীভাবে পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল তা নিচের চিত্রে লক্ষ কর।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

বড় গাছের উপর ছোট গাছ

পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ

মানুষ বিভিন্নভাবে পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তার প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে পরিবেশ ব্যবহার করছে।

পরিবর্তিত পরিবেশের চিত্রে কী কী পরিবর্তন দেখছো? কীভাবে এসব পরিবর্তন ঘটেছে?

তোমার এলাকায় বা স্কুলের আশপাশে কি এমন কোন পরিবেশ তুমি দেখেছো যার পরিবর্তন ঘটেছে? কেন পরিবর্তন ঘটেছে? অনুসন্ধান করে শ্রেণিতে শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

মানুষের কারণে পরিবেশের পরিবর্তন

প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশের পরিবর্তন

বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন সম্পদ আমরা নানাভাবে ব্যবহার করছি। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষ তৈরি করছে নূতন নূতন বাড়িঘর, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, কল-কারখানা, যানবাহন, সেতু, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য ভরাট করছে নদী-নালা, কেটে ফেলছে বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত। ফলে পশু-পাখি হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল। এসব কারণে পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কল-কারখানা থেকে বের হচ্ছে রাসায়নিক বর্জ্য। যানবাহন, ইটের ভাটা থেকে কালো ধোঁয়া। যেখানে সেখানে মানুষ আবর্জনা ফেলছে। যা বিভিন্নভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে। মানুষের এসব বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

এ অধ্যায়ে আমরা জীবের বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানলাম। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পুষ্টি, আলো, পানি, বায়ু এবং আবাসস্থল। আরও জানলাম পরিবেশের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং এই পরিবেশের সম্পদের বিভিন্ন ব্যবহার। মানুষ তার প্রয়োজনে তৈরি করেছে বাড়িঘর, কল কারখানা ইত্যাদি। কেটে ফেলছে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। যার ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য বায়ু থেকে ——————গ্রহণ করে।
খ. মানুষ ও সকল —————— খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।
গ. প্রাণী নিজের —————— নিজে তৈরি করতে পারে না।
ঘ. প্রত্যেক জীবের বেঁচে থাকার জন্য—————— প্রয়োজন।

সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

১. খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদ কোনটি ব্যবহার করে?
(ক) বায়ু (খ) সূর্যের আলো
(গ) জলীয় বাষ্প (ঘ) অক্সিজেন

২. উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য যে শক্তি ব্যবহার করে তা কোথা থেকে পায়?
(ক) পানি (খ) বায়ু
(গ) সূর্য (ঘ) কার্বন ডাই অক্সাইড

৩. পরিবেশে উদ্ভিদ কীভাবে অক্সিজেন সরবারাহ করে?
(ক) খাদ্য তৈরির মাধ্যমে (খ) শ্বাসকার্যের মাধ্যমে
(গ) মাটি থেকে রস নেওয়ার মাধ্যমে (ঘ) বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উদ্ভিদের জীবনে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীলতার দুটো উদাহরণ দাও।
৩. উদ্ভিদ কীভাবে প্রাণীর ওপর নির্ভর করে তা ছবি এঁকে দেখাও।
৪. খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের ওপর প্রাণীর নির্ভরশীলতার দুটো উপায় লিখ।

নিচের ছকে কয়েকটি জীবের ছবি দেওয়া হয়েছে। এ সকল জীবের বেঁচে থাকার জন্য কী কী প্রয়োজন তা লিখে ছকটি পূরণ কর।

জীব	বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন
	১.
	২.
	১.
	২.
	১.
	২.
	১.
	২.

কাজ

ক. শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন করে নিচের কাজগুলো কর। স্কুলের আশপাশের বাগান বা খেতে একটি ছোট স্থান নির্দিষ্ট কর। যার পরিধি ৫ মিটার বাই ৫ মিটার হতে পারে। স্থানটি পর্যবেক্ষণ কর। এখানে কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী তুমি দেখেছো তার একটি তালিকা তৈরি কর।

খ. তুমি যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করেছো, তাদের মধ্যে কীভাবে একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল তা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

গ. কাজটি শেষে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

অধ্যায়-২

উদ্ভিদ ও প্রাণী

এই পৃথিবীতে রয়েছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও প্রাণী। বিভিন্নভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বাসস্থানের ভিত্তিতেও উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।

কীভাবে উদ্ভিদকে প্রাণীদের থেকে আলাদা করবে?

নিচের কাজটি করার মাধ্যমে অনুসন্ধান কর:

কাজ

১. তোমার নিকট পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ কর।
২. তাদের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ কর এবং পাশের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ কর।

উদ্ভিদ	প্রাণী
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

তোমার খুঁজে পাওয়া পার্থক্যের সঙ্গে নিচের পার্থক্যগুলো মিলিয়ে দেখ–

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

- উদ্ভিদ প্রাণীর মতো খাদ্য গ্রহণ করে না। কঠিন কিংবা শক্ত খাদ্য এরা গ্রহণ করতে পারে না। প্রাণী কঠিন, তরল সব রকম খাদ্য গ্রহণ করে।
- উদ্ভিদ সূর্যের আলো ও পানির সাহায্যে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের জন্য প্রাণী উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।
- উদ্ভিদ চলাচল করতে পারে না। তবে উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন মূল, কান্ড, পাতা ইত্যাদি নড়াচড়া করে। প্রাণী একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করতে পারে।

আমগাছ

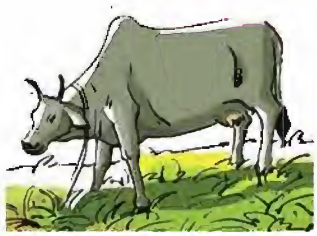
গোরু

- প্রাণীর চোখ, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ রয়েছে।
  উদ্ভিদের রয়েছে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা।
- মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়।
  নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রাণীদেহে বৃদ্ধি ঘটে।

বাসস্থানের ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্নতা

তোমার আশেপাশের পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে কি কোনো ভিন্নতা দেখতে পাও? এ সকল ভিন্নতার কারণ কী?

তেলাপোকা

চিংড়ি

বিড়াল

ছাগল

কাজ: তোমার স্কুল ও বাড়ির আশপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছক দুটো পূরণ কর।

ছক ১. বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ

ক্রমিক নং	উদ্ভিদের নাম	যে পরিবেশে জন্মেছে	আকার/ আকৃতি	এর উপরে/কাছে কোন প্রাণীর বাস
১	আম	স্থলজ	বড়	কীট পতঙ্গ/পাখি
২				
৩				

ছক ২. বিভিন্ন ধরনের প্রাণী

প্রাণীর নাম	আশ্রয়স্থল/ বাসস্থান	আকার/ আকৃতি	খাদ্যের উৎস
ব্যাঙ	জল ও স্থল উভয় স্থান	ছোট	কীটপতঙ্গ

ছক দুটো পূরণ হয়ে গেলে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণী যে সকল পরিবেশে বাস করে তার সাথে এদের আকার আকৃতির বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের মিল আছে কি? এ বিষয়ে তোমার শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার সকল উপাদান যখন একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে পায়, তখন সেটি তার বাসস্থান।

বনজঙ্গলের পরিবেশ

পানির পরিবেশ

পরিবেশে বাসস্থানের ভিত্তিতে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশ রয়েছে। যেমন স্থলজ পরিবেশ, মরুভূমির পরিবেশ, জলজ পরিবেশ, পাহাড়-পর্বতের পরিবেশ ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিবেশের বৈশিষ্ট্যও আলাদা। বিভিন্নভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী এসকল পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়ায়।

স্থলজ পরিবেশের মধ্যে মরুভূমি অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। সেখানে শুধু বালি আর বালি। পানির পরিমাণ খুবই কম। এসকল স্থানে যে উদ্ভিদ জন্মে তার মধ্যে ক্যাকটাস বা ফনিমনসা জাতীয়

উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য। এসকল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো এদের পাতা ও কান্ড রসাল। যা পানি ধারণ করে। উটের কথা তোমরা শুনেছো। কেউ বা হয়তো উট দেখেও থাকবে। মরুভূমিতে চলাচলের জন্য উট শরীরে পানি ও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী

বিভিন্ন বনাঞ্চলের মধ্যে আমাদের দেশের সুন্দরবন সম্পর্কে তোমরা জান। এখানকার পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তা অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। এদের রয়েছে শ্বাসমূল যা শ্বাসগ্রহণের জন্য মাটির উপরে থাকে। সুন্দরবনে থাকে বানর, কুমির, চিত্রা হরিণ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী শুধু পানিতে বাস করে। কিছু কিছু উদ্ভিদ জল ও স্থল উভয় পরিবেশে থাতে পারে। যেমন– শামুক, ব্যাঙ, কচ্ছপ ইত্যাদি। কলমি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি উদ্ভিদও উভয় পরিবেশে জন্মাতে পারে।

সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণী

পানিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে বা যে সকল প্রাণী বাস করে তা কি কখনো খেয়াল করেছো?

পানির উদ্ভিদ বা জলজ উদ্ভিদের মধ্যে আমাদের দেশে রয়েছে কচুরিপানা, শাপলা ইত্যাদি। প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঝিনুক, চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি। তোমরা জান, পানিতে যে

সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে তারা ডাঙায় বেঁচে থাকতে পারে না।

এ সকল পরিবেশ ছাড়াও কোন কোন উদ্ভিদ আছে যারা অন্য কোন বড় উদ্ভিদের ওপর জন্মে। যেমন– স্বর্ণলতা, রাস্না ইত্যাদি। আবার বড় বড় অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন প্রাণী বাস করে।

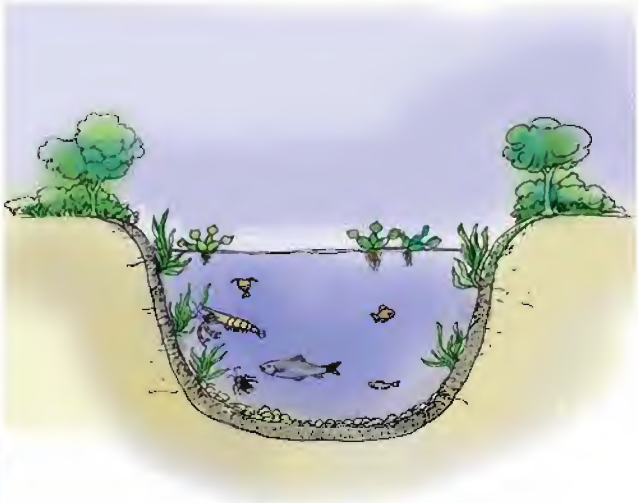

পুকুরের পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

গাছে বাবুই পাখির বাসা

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ কী?

তোমরা প্রায়ই শুনে থাকবে আগে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল তাদের অনেকেই আজ পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

কেন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে?

কাজ: উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ লিখে শ্রেণিতে তোমার শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

প্রাকৃতিক কিছু কারণ যেমন– বন্যা, ঝড়, খরা ইত্যাদির জন্য পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে। যেমন– বিভিন্ন জলাশয় ভরাট করে ফেলার কারণে মাছ কমে যাচ্ছে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম–

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে সকল পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা শিখলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মে। পরিবেশের বিভিন্নতার কারণেও উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। এছাড়া আরও জানলাম বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী কোন কোন কারণে আজ পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. রয়েল বেঙ্গল টাইগার ———————— থাকে।
খ. উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন প্রাণীর ————————।
গ. পরিবেশে বাসস্থানের ভিত্তিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর———————— রয়েছে।
ঘ. শাপলা একটি ———————— উদ্ভিদ ।

বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশের মিল কর

খাদ্যের জন্য প্রাণী	মানুষের কর্মকাণ্ড
উট	নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে
উদ্ভিদ	পানি সঞ্চয় করে
উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কারণ	উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল
	নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. মরুভূমিতে কোন উদ্ভিদ জন্মে?

(ক) ফনিমনসা (খ) শাপলা
(গ) পদ্ম (ঘ) পাতাবাহার

২. নিচে কয়েকটি উদ্ভিদের ছবি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কোনটি শুধু পানিতে জন্মে?

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

৩. শ্বাসমূল কোন অঞ্চলের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য?

(ক) মরুভূমি (খ) পাহাড়
(গ) সুন্দরবন (ঘ) হাওড়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. জলজ পরিবেশের দুটো জীবের নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখ।
খ. পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন বাসস্থানের একটি তালিকা তৈরি কর।
গ. এমন দুটো প্রাণীর নাম লিখ যারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এদের বিলুপ্ত হওয়ার কারণ উল্লেখ কর।
ঘ. আবাসস্থল কীভাবে জীবকে টিকে থাকতে সহায়তা করে ?

অধ্যায়–৩

মাটি

মাটি পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মাটিতে গড়ে ওঠে উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল। মানুষসহ প্রায় সকল প্রাণীই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এই উদ্ভিদ জন্মে মাটিতে। আবার ভালো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য চাই দূষণমুক্ত মাটি।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বলতে আমরা কি বুঝি?

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বলতে বুঝানো হয় নির্মল বায়ু, দূষণমুক্ত পানি ও পরিষ্কার মাটি। আমরা যখন কোন ভ্রমণের স্থান দেখি তখন খুব ভালো লাগে। আবার যখন কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত স্থান বা সংরক্ষিত বনের দৃশ্য দেখি তখন মন জুড়ায়। যেমন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান, সুন্দরবন, বোটানিকেল গার্ডেন ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

কৃত্রিম পরিবেশ

অপরিচ্ছন্ন গ্রামীণ ও শহরের পরিবেশ কেমন?

ঘনবসতির গ্রামীণ ও শহর এলাকায় সাধারণত নোংড়া, পচা, ময়লা-আবর্জনা এবং মলমূত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কুকুর, বিড়াল ও পাখি ময়লা খাচ্ছে। চারপাশ দুর্গন্ধে ভরা। মানুষ নাক-মুখ ঢেকে পাশ দিয়ে চলছে। ফলে আশেপাশের বাসিন্দারা দুর্গন্ধে ভোগে। কেন এমন ঘটে? নিশ্চয়ই বলবে, ময়লা নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থার অভাবে।

গ্রামীণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

শহরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ

কাজ: বাড়িতে দৈনন্দিন কী কী আবর্জনা তৈরি হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
এই আবর্জনা আমরা কোথায় ফেলি? কেন ফেলি?

যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে পরিবেশ দূষিত হয় দুর্গন্ধ ছড়ায়। নানা প্রকার রোগজীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমরা কী করতে পারি?

১. বাড়ির দৈনন্দিন ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।
২. বাড়ির আবর্জনাগুলো গর্ত করে মাটি চাপা দিতে হবে।
৩. বড় বড় শহরে আজকাল বাড়ির ময়লা একত্র করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়।

মাটির উর্বরতা কী?

মাটির ফসল উৎপাদন ক্ষমতাকেই বলা হয় উর্বরতা। আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং উদ্ভিদেরও জীবন ধারণ, দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য নানারকম উপাদান দরকার হয়। এসব উপাদানের বেশির ভাগ আসে মাটি থেকে যেমন– নাইট্রেট, ফসফেট, পটাশ ইত্যাদি।

যে মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদান বেশি থাকে, তা বেশি উর্বর। আবার যে মাটিতে এদের উপস্থিতি কম তাকে বলা হয় অনুর্বর মাটি। এ ধরনের মাটিতে সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়।

মাটির উর্বরতা কীভাবে বাড়ানো হয়?

মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য কৃষক যে দ্রব্য মাটিতে মিশায় তাই সার। আসলে সারের মধ্যেও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলো থাকে। সারের উৎস বা উপাদান অনুযায়ী সার দুই প্রকারের হয়। যেমন– জৈব সার এবং অজৈব সার।

অজৈব সার : ইউরিয়া

জৈব সার : কম্পোস্ট

অজৈব সার : টি এস পি

আর কী উপায়ে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা যায়?

একই জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করলে তা মাটি থেকে একই ধরনের খনিজ উপাদান আহরণ করে থাকে। যেমন– একই জমিতে পরপর একই ফসল চাষ না করে পর্যায়ক্রমে, একাধিক ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা রক্ষা করা যায়। এতে এক এক ধরনের উদ্ভিদ মাটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন খনিজ উপাদান গ্রহণ করে।

মাটি দূষণের কারণ ও দূষণের ফলাফল

মাটির বিশেষ গুণ হচ্ছে জৈব দ্রব্যকে প্রাকৃতিক নিয়মে মাটিতে রূপান্তর করা। মানুষের নানারকম কাজের কারণে মাটি দূষিত হয়ে থাকে। যেমন, বাড়ির ময়লা ও মল-মূত্র, হাট-বাজার, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির বর্জ্য প্রতিদিন মাটিতে ফেলা হয়। এর অনেকই মাটি শোধন করতে পারে না। চাষাবাদে বেশি পরিমাণে অজৈব সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার মাটি দূষণের বড় কারণ। মাটির নিচের লবণ পানিতে গলে উপরে উঠে মাটিকে অনুর্বর

করে। আবার বর্জ্যের প্লাস্টিক ও পলিথিন মাটিতে পচে না। এর উপস্থিতি মাটির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

কীটনাশকের ব্যবহার

মাটি দূষণ

এবারে বলতো, মাটি দূষণের ফলে কীরকম বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়?

মাটি দূষিত হলে তাতে গাছপালা, পোকামাকড়, কেঁচো, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জন্মাতে পারে না। ফলে মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। এতে মাটি ধীরে ধীরে মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

তোমার এলাকায় মাটি কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকটি পূরণ কর :

মাটি দূষণের কারণ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

আমরা কী কী উপায়ে মাটির দূষণ রোধ করতে পারি?

বসবাস, খাদ্য উৎপাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আমরা যে মাটির উপর নির্ভরশীল তা তুলে ধরা। মাটি দূষণের কারণগুলো রোধ করা। বাড়িঘর ও হাটবাজারের ময়লা-আবর্জনা ও মলমূত্র মাটিতে পুতে ফেলার ব্যবস্থা করা। শিল্প-কারখানা ও হাসাপাতালের বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা করা এবং তা উন্মুক্ত স্থান ও পানিতে না ফেলা হয়। বন ও বাগান সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি

করা। অজৈব সারের পরিবর্তে সবুজ সার, হিউমাস, গোবর সার, খইল, কম্পোস্ট ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ানো। কীটনাশক, আগাছানাশক ব্যবহারের পরিমাণ কমানো। পলিথিনের পরিবর্তে পাট বা কাগজের তৈরি দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

মাটি কীভাবে ক্ষয় হয়?

সাধারণত গাছপালা শিকড় দিয়ে জমির মাটি আঁকড়ে রাখে। কিন্তু গাছপালা কেটে উজাড় করলে উপরের মাটি আলগা হয়ে যায়। ফলে ঝড়, বৃষ্টি ও বাতাসের সঙ্গে উপরের মাটি অন্যত্র বাহিত হয়ে যায়। এতে মাটির ক্ষয় হয়। আবার প্রাকৃতিক ও মানুষের কারণে নদী ভাঙ্গনের ফলে অনেক আবাদী ও অনাবাদী জমি পানিতে তলিয়ে যায়।

কীভাবে মাটি সংরক্ষণ করা যায়?

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বন-বাগান ধ্বংস না করা। পতিত জমিতে ঘাস জন্মান। মাটি উন্মুক্ত না রাখা। মাটি ঘেঁষে ঘাস না কাটা। ফসলের অপ্রয়োজনীয় গোড়া মাটিতে রেখে দেয়া। কৃষি খেতের মাঝে মাঝে উঁচু আইল বাধা। জমি ও খেতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে ঝড়, বৃষ্টি, পানি ও বাতাসের গতি কমানো। ধীর গতিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। ধান কাটার পর জমিতে থাকা এর গোড়া পোড়ানো বন্ধ করা। এছাড়া নদী ও সাগর তীরে বেড়িবাধ নির্মাণ করা।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি

সুস্থ ও সবল জীবন যাপনের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রয়োজন। এর জন্য বাড়ির দৈনন্দিন ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা দরকার। মাটির ফসল উৎপাদন ক্ষমতাই হচ্ছে উর্বরতা। মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য যে দ্রব্য মাটিতে মেশানো হয়, তাই সার। যে সব কারণে মাটি দূষিত হয় সেগুলো দূর করতে পারলে মাটি দূষণ রোধ করা সম্ভব।

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ

ক. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বলতে বুঝায় নির্মল বায়ু, _____ মাটি।
খ. _____ মাটিতে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে।
ঘ. মাটি ক্ষয় রোধে _____ ও বাগান সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা।
ঙ. মাটির ফসল উৎপাদন ক্ষমতাকেই _____ বলা হয়।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. মাটি দূষণ রোধের উপায় কোনটি ?
ক) অজৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো
খ) মাটি ঘেঁষে ঘাস কাটা
গ) জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো
ঘ) পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো

২. কোনটি জৈব সার ?
ক) ইউরিয়া
খ) টি এস পি
গ) পটাশ
ঘ) গোবর সার

৩. কোনটি মাটিতে মিশে না ?
ক) হিউমাস
খ) অজৈব সার
গ) প্লাস্টিক
ঘ) জৈব সার

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর

বাম	ডান
ক. মাটি দূষণের কারণ	ক. নদী ভাঙন রোধে বেড়িবাঁধ দেওয়া
খ. মাটির উর্বরতা রক্ষা	খ. হাসপাতালের বর্জ্য মাটিতে ফেলা
গ. মাটি দূষণ রোধ	গ. একই জমিতে পর্যায়ক্রমে একাধিক ফসল ফলানো
ঘ. মাটি সংরক্ষণ	ঘ. কীটনাশক ও আগাছা নাশকের ব্যবহার কমানো
	ঙ. ফসল ফলানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. কৃষক কিভাবে মাটির উর্বরতা বাড়ায় ?
খ. মাটি সংরক্ষণের উপায় কী ?
গ. জৈব ও অজৈব সারের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মাটি দূষণের কারণ ব্যাখ্যা কর।
খ. মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য কী কী করা যেতে পারে ?
গ. পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কী ? কীভাবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় ?
ঘ. মাটি দূষণ রোধের উপায়গুলো লিখ।

অধ্যায়-৪

খাদ্য

আমরা কেন খাই, কী খাই এবং কোথা থেকে খাবার পাই তা জেনেছি। শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমরা খাবার খাই। নিয়মিত খাবার না খেলে শরীর দুর্বল হয়। কেননা ছোট বড় সকলকে প্রতিদিন পড়ালেখা ও খেলাধুলা ছাড়াও নানা রকম কাজ করতে হয়। এজন্য আমাদের শরীরের শক্তি প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমরা খেয়ে থাকি।

আমরা কেমন করে খাদ্য নির্বাচন করে থাকি?

যে সব দ্রব্য আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করে তাই খাদ্য। খাদ্যের মোট উপাদান ছয়টি। এগুলো হলো আমিষ, শর্করা, স্নেহ বা তেল, পানি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। এবার দেখ, নিচের খাদ্য দ্রব্যগুলো চিনতে পার কি না?

নিচের ছক খাতায় এঁকে খাদ্য উপাদান ও তাদের উৎসের নাম লিখ।

খাদ্য উপাদান	কোন কোন খাবারে পাওয়া যায় তার নাম

একটি প্রধান খাদ্য উপাদান হিসাবে আমিষ

আমরা ছোট থেকে বড় হচ্ছি। বয়সের সাথে শরীর বাড়তে থাকে। তাই প্রয়োজনমতো সব ধরনের খাবার না খেলে দেহের বৃদ্ধি ঠিকমতো হবে না। আবার প্রয়োজনের তুলনায় কম খেলে শরীরে অপুষ্টি দেখা দেয়। এতে শরীর অসুস্থ হয়। আমিষের অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে না। কারণ আমিষের প্রধান কাজ দেহের গঠন, বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা।

আমিষ জাতীয় খাবারের উৎস কী কী?

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আমিষ খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত খাওয়ার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ করা যায়।

প্রাণীজ আমিষ

উদ্ভিজ্জ আমিষ

উপরের চিত্রের খাদ্যদ্রব্য থেকে তোমার পছন্দের উদ্ভিজ্জ প্রাণীজ আমিষ খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

খাদ্য উপাদান হিসাবে ভিটামিন

ভিটামিন দেহের কী উপকারে লাগে?

দেহকে সুস্থ রাখা ও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ভিটামিন প্রয়োজন। ভিটামিনের অভাব ঘটলে শরীরে নানা রকম রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন মুখে ঘা, শিশুর পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া, রাতকানা, রিকেটস ইত্যাদি রোগ হয়। ভিটামিনের অভাবে শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

রাতকানা আক্রান্ত শিশু

আয়ডিনের অভাব জনিত রোগ

ভিটামিন কী এবং কোথা থেকে আমরা ভিটামিন পেয়ে থাকি?

আমরা জেনেছি ভিটামিন হচ্ছে এক প্রকার খাদ্য উপাদান, যা পরিমাণে খুব সামান্য লাগে। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে ভিটামিন পাওয়া যায়। যেমন টাটকা ও তাজা রঙিন শাক-সবজি ও ফল। প্রাণীজ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ডিম, দুধ, কলিজা, মাছের তেল ইত্যাদি।

ভিটামিনযুক্ত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য

ভিটামিন কত প্রকার ও কী কী এবং তাদের কাজ কী?

দেহে সুনির্দিষ্ট কাজ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিটামিন ছয় প্রকারের হয়। যেমন ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে' এবং ভিটামিন 'বি' ও 'সি'। এদের মধ্যে প্রথম চারটি তেলে দ্রবীভূত হয়। শেষের দুটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। তাই এ দুটি দেহে মওজুদ থাকে না বললেই চলে। এজন্য, বিশেষ করে ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার নিয়মিত খেতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস ও অভাবজনিত রোগ নিচের ছকে দেখান হলো:

ভিটামিনের নাম	উৎস	অভাবজনিত রোগ
ভিটামিন 'এ'	দুধ, মাখন, ডিম, ছোট মাছ, বড় মাছ, গাজর শাক, হলুদ ফল ইত্যাদি	শিশুদের রাতকানা রোগ
ভিটামিন 'ডি'	ডিম, দুধ, দুগধজাত খাদ্য, মাছের তেল ইত্যাদি	হাড় বেঁকে যাওয়া বা রিকেট রোগ
ভিটামিন 'ই'	সবুজ শাক-সবজি, পালং শাক, বাঁধাকপি কলিজা, লেটুস ইত্যাদি	রক্তশূন্যতা
ভিটামিন 'কে'	পালংশাক, টমেটো, বাধাকপি, সয়াবিন ইত্যাদি	রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে
ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স	ঢেকিছাঁটা চাল, কলিজা, শাক-সবজি অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদি	ঠোঁটে ও জিহ্বায় ঘা, অকারণে মন খারাপ
ভিটামিন 'সি'	লেবু, বাতাবি লেবু, আমড়া, টমেটো, পেয়ারা আমলকি ইত্যাদি	স্কার্ভি, দাঁতের মাড়ির অসুখ ছাড়াও সর্দিকাশি হয়

সুষম খাদ্য এবং সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা?

কোন খাদ্য দ্রব্যে কী কী উপাদান কি পরিমাণে আছে তা জানা প্রয়োজন। যে খাদ্যে পরিমাণমতো সব উপাদান, যেমন আমিষ, শর্করা, স্নেহজাতীয় বা তেল, ভিটামিন ও খনিজ লবণ ও পানি থাকে তাই সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্য শরীরের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ করে এবং শক্তি যোগায়।

কীভাবে সুষম খাদ্য নির্বাচন করা যায়?

নিচের তিনটি তালিকার প্রতিটি থেকে খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করে সুষম খাদ্য পাওয়া যাবে কি?

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য		সুষম খাদ্য
১	চাল, আটা, আলু	
২	ডাল, মাছ, মাংস, ডিম	
৩	লাল শাক, লাউ, কুমড়া, কলা, পেয়ারা ও লেবু	

প্রতিটি তালিকা থেকে কমপক্ষে একটি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সুষম খাদ্য পাওয়া যাবে। তবে এর সঙ্গে প্রতিদিন ৬-৭ গ্লাস নিরাপদ পানিও পান করতে হবে।

সহজলভ্য সুষম খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি?

স্বল্পমূল্যের সহজলভ্য সুষম খাদ্যদ্রব্য বলতে বোঝায় যা দেশের অধিকাংশ স্থানে বেশি জন্মায় বা পাওয়া যায়। তাই মূলত উদ্ভিদজাত খাদ্যদ্রব্যই সহজলভ্য। এছাড়া রয়েছে ছোট মাছ এবং দেশীয় ফলমুল যেমন– কলা, আম, জাম, লিচু ইত্যাদি। এ সকল খাদ্যদ্রব্য মিলিয়ে আমরা স্বল্প মুল্যের সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারি।

এবার নিচের তালিকা অনুযায়ী তোমার সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের সুষম খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের সুষম খাদ্য সামগ্রী	
খাদ্য উপাদান	খাদ্যদ্রব্য
আমিষ	ছোট মাছ, সামুদ্রিক মাছ, শুটকিমাছ, ডাল, সীমের বীচি ইত্যাদি।
শর্করা	চাল, আটা, আলু ইত্যাদি।
স্নেহ বা তেল	চীনা বাদাম, সয়াবিন, নারিকলে তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।
ভিটামিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফল	শাক-সবজি, আমড়া, আমলকি, কলা, পেয়ারা, বেল কাঁঠাল ইত্যাদি।
খনিজ লবণ সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফল	শাক-সবজি, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, আতা, আমড়া, আমলকি কলা, পেয়ারা, বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, এর সঙ্গে অবশ্যই নিয়মিত নিরাপদ পানি পানের প্রয়োজন হবে।

এ তালিকা ঠিক হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষককে দেখাও।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি

শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য সুষম খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি যোগায় এবং রোগ প্রতিরোধ করে। খাদ্যে মোট ছয় প্রকার উপাদান থাকে, যেমন– আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় বা তেল, পানি, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। সব খাদ্যদ্রব্য আমরা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পেয়ে থাকি। আমিষ দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। যেমন ডাল, মটরশুটি, সিমের বিচি ইত্যাদি। ভিটামিন হচ্ছে একটি স্বল্প পরিমাণের খাদ্য উপাদান, যা দেহের সঠিক পুষ্টির জন্য খুব প্রয়োজনীয়। ভিটামিন ছয় প্রকারের হয়ে থাকে। দেহকে সুস্থ রাখা ও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ভিটামিন প্রয়োজন। ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, রিকেট, স্কার্ভি ইত্যদি রোগ হয়। যেমন মুখে ঘা, শিশুর পায়ের হাড় বেঁকে যাওয়া, রাতকানা, রিকেটস ইত্যাদি রোগ হয়। এভাবে শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ কর।

ক. যে সব দ্রব্য আমাদের শরীরের————————সাধন করে তাকে বলা হয় খাদ্য।
খ. ————————অভাবে দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ ব্যহত হয়।
গ. দেহকে সুস্থ রাখা ও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ————————।
ঘ. উদ্ভিদজাত খাদ্য দ্রব্যের সংগে ছোট মাছ মিশিয়ে ————————খাদ্য নির্বাচন করা যায়।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

ক. কোনটির অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়–
১) ভিটামিন 'সি' ২) ভিটামিন 'কে'
৩) ভিটামিন 'এ' ৪) ভিটামিন 'ডি'

খ. চাল, আটা ও আলু কী জাতীয় খাদ্য?
১) খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্য ২) আমিষ জাতীয় খাদ্য
৩) শর্করা জাতীয় খাদ্য ৪) ভিটামিন জাতীয় খাদ্য

গ. নিচের কোনগুলো দিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়।

১) চাল, ডাল, তেল, লবণ ২) শাক, মাছ, তেল

৩) আলু, ভাত, রুটি, ডিম ৪) ঘি, মাখন, পাউরুটি, কলা

ঘ. সবল দেহ সুস্থ সংরক্ষণ ও কাজ করার জন্য প্রয়োজন–

১) স্নেহ বা তেল জাতীয় খাদ্য ২) আমিষ জাতীয় খাদ্য

৩) সহজলভ্য ও সস্তা খাদ্য ৪) পুষ্টিকর সুষম খাদ্য

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর

বাম	ডান
ক. ভিটামিন	ক. শর্করার একটি উৎস।
খ. বিভিন্ন প্রকারের ডাল	খ. রিকেট রোগ হয়।
গ. ভিটামিন 'সি' এর অভাব	গ. আমিষের একটি উৎস।
ঘ. ভিটামিন 'ডি' এর অভাবে	ঘ. বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ।
ঙ. স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়	ঙ. ঔষধ হিসাবে পাওয়া যায়।
	চ. দাঁতের মাড়ির অসুখ হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. গতকাল তুমি যে যে খাবার খেয়েছ তার একটি তালিকা তৈরি কর। খাদ্যগুলোর নামের সামনে তাতে পাওয়া খাদ্য উপাদানের নাম লিখ।

খ. খাদ্যের ছয়টি উপাদান ও তাদের উৎসের তুলনা কর।

গ. তোমার পরিবারের জন্য একটি সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি কর।

ঘ) আমিষ পাওয়া যায় এমন একটি উদ্ভিদ ও একটি প্রাণীর নামসহ চিত্র আঁক।

ঙ) খাদ্যের ভিটামিন আমাদের কী কাজে লাগে?

রচনামূলক প্রশ্ন:

ক. আমিষ জাতীয় খাদ্য কী? আমিষ জাতীয় খাদ্য কত প্রকার ও কী কী বর্ণনা কর।

খ. সুষম খাদ্য ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। সুষম খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

গ. ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি এর উৎস ও অভাবজনিত রোগের নাম লিখ।

অধ্যায়-৫

স্বাস্থ্যবিধি

তোমার শরীর যদি সুস্থ না থাকে তবে কী ঘটবে? অর্থাৎ শরীর সুস্থ না থাকলে মন ভালো থাকে না। পড়ালেখা বা অন্যকোন কাজও করা যায় না। সুতরাং সুস্থ থাকতে হলে শরীরের যত্ন নিতে হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। এর জন্য কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য তুমি কী কী করবে?

কাজ: নিচের ছকটি পূরণ কর।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য করণীয়

১. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	
ক. চুল	
খ. দাঁত	
গ. নখ	
ঘ. কান	
ঙ. হাত-পা	
২. ব্যক্তিগত জিনিসপত্র	
ক. কাপড় চোপড়	
খ. বই খাতা	
গ. পড়ার টেবিল	
ঘ. বিছানা	

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কেন প্রয়োজন?

তোমরা কি জান ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে প্রতিবছর আমাদের দেশে অনেক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়? এসব রোগের মধ্যে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরাসহ অন্যান্য পেটের পীড়ার নাম তোমরা শুনেছো। সুতরাং এসব রোগ থেকে রক্ষা পেতে এবং সুস্থ থাকতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

কাজ: শরীর সুস্থ রাখার জন্য তুমি কী কী করবে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য করণীয়	
১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায়

স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে–

১. নিরাপদ পানি পান করতে হবে।
২. পানীয় জল নিরাপদভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. কাঁচা ফলমূল খাওয়ার আগে ও শাকসবজি রান্নার আগে নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে।
৪. খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে যেন মাছি বা পোকামাকড় বসতে না পারে।
৫. খাওয়ার পূর্বে ও মল ত্যাগের পরে সাবান দিয়ে দুহাত ভালো করে ধুতে হবে।
৬. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা উচিত। যাতে মলমূত্র যেখানে সেখানে না ছড়ায়।
৭. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

কাজ: ১. গত এক বছরে তোমার পরিবারে কী কেউ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছে? তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং পরবর্তি ক্লাসে উপস্থাপন কর।
২. উপস্থাপনের সময় রোগগুলো কী কী ভাবে ছড়ায় তা আলোচনা করবে।

পানিবাহিত রোগ

যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের ফলে তা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে পুকুরসহ বিভিন্ন জলাশয়ে পড়ে। ফলে পানি দূষিত হয়। এ পানি আমরা যদি ব্যবহার করি তবে রোগে আক্রান্ত হই।

এছাড়াও যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করলে মাছি সেখান থেকে জীবাণু বহন করে এনে আমাদের খাবারের উপর বসে। যা খাবারকে দূষিত করে। মল থেকে এসব রোগ-জীবাণু পানির মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ পানির মাধ্যমে ছড়ায়। সেজন্য এসব রোগ পানিবাহিত রোগ নামে পরিচিত।

কাঁচা ল্যাট্রিন

নিচের ছবিতে দেখ কীভাবে পানির মাধ্যমে রোগ ছড়ায়

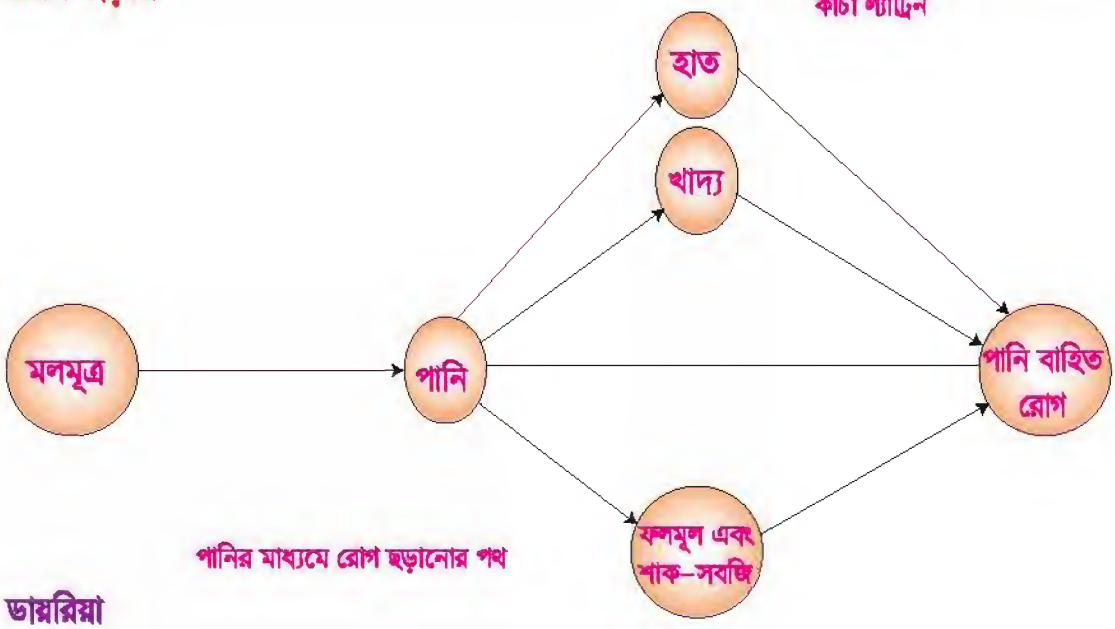

পানির মাধ্যমে রোগ ছড়ানোর পথ

ডায়রিয়া

ডায়রিয়া হলে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। ফলে শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতলা পায়খানার সাথে সাথে পানির পিপাসা বেড়ে যায়। মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যায়। ডায়রিয়ার জীবাণু সাধারণত দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

কীভাবে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করবে?

সবসময় নিরাপদ পানি পান করবে। খাওয়ার পূর্বে এবং মলমূত্র ত্যাগের পর সাবান ও পানি দিয়ে দুহাত ভালোভাবে ধুতে হবে এবং সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

কারো ডায়রিয়া হলে তাকে ঘন ঘন খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। আজকাল বাজারে খাবার স্যালাইন পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে দুবারের বেশি পাতলা পায়খানা হলেই রোগীকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। এ স্যালাইন গুড় অথবা চিনি ও লবণ দিয়ে বাসায়ও বানানো সম্ভব।

কীভাবে স্যালাইন বানাবে?

প্রথমে একটি পরিষ্কার পাত্রে আধা লিটার ফুটানো ঠান্ডা পানি নাও। এবার হাত ভালোভাবে ধুয়ে এক মুঠো গুড় অথবা চিনি নিয়ে পানিতে ছাড়। তিন আঙুলের মাথা দিয়ে এক চিমটি খাবার লবণ ঐ পানিতে মেশাও। তারপর নেড়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

খাবার স্যালাইন বানানো

প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডায়রিয়া ছাড়াও কলেরাতে পাতলা পায়খানা হয়। এতে পায়খানার সাথে যে পানি বের হয় তা চাল ধোয়া পানির মত। এটা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। কলেরা হলে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিতে হবে। কলেরা রোগীর শরীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

আমাশয় রোগ হওয়ার কারণ এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়?

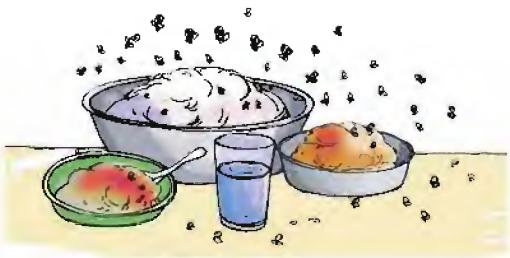

খোলা খাবার

দূষিত পানি, বাসি খাবার, মাছি ইত্যাদির মাধ্যমে আমাশয় রোগ ছড়ায়। কারো আমাশয় রোগ হলে পেটে ব্যাথা হয়। পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। পায়খানার সাথে আম ও রক্ত পড়ে।

আমাশয় থেকে রক্ষা পেতে হলে সব সময় নিরাপদ পানি পান করবে। খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পর দুহাত ভালোভাবে সাবান এবং পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে। এ রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলতে হবে। পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

টাইফয়েড

দূষিত পানির মাধ্যমে টাইফয়েড ছড়ায়। এ রোগ সংক্রামক। কেউ টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে প্রথমদিকে তার জ্বর অল্প থাকে। পরবর্তীতে জ্বর ধীরে ধীরে বাড়ে। সাথে মাথা ও পেট ব্যাথা করে। এই জ্বর হলে রোগীর খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যায়। শরীর ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়ে।

এ রোগের জীবাণু রোগীর মলমূত্রের সাথে বের হয়। এই মলমূত্র কোনোভাবে যদি খাবার বা পানিতে মিশে তাহলে জীবাণু ছড়ায়।

টাইফয়েড প্রতিরোধের উপায়

টাইফয়েড থেকে রক্ষা পেতে হলে সবসময় নিরাপদ পানি পান করতে হবে। খোলা ও বাসি খাবার পরিহার করতে হবে। রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র আলাদাভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

জন্ডিস

জন্ডিস আরেকটি পানিবাহিত রোগ। দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। জন্ডিস হলে রোগীর অল্প অল্প জ্বর থাকতে পারে। বমি বমি ভাব হয়। চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায়। অনেক সময় পেটের ডান দিকে ব্যাথা হয়। খাওয়ার অরুচি হয়। শরীর জ্বালাপোড়া করে। কখনও কখনও শরীর চুলকায়।

জন্ডিস প্রতিরোধে করণীয়

রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। যেহেতু এ রোগ সংক্রামক বা ছোঁয়াচে, সেজন্য রোগীকে

আলাদা করে রাখতে হবে। রোগীর থালা-বাসন আলাদা রাখতে হবে। এ রোগের জীবাণু মলমূত্রের মাধ্যমে পানির সাথে মিশে। এ কারণে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের রোগীকে প্রচুর পরিমাণ পানি ও পানি জাতীয় খাবার দিতে হবে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম:

- সুস্থ থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই শরীরের যত্ন নিতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- বিভিন্নভাবে আমাদের শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে। পানির মাধ্যমে যেসব রোগ ছড়ায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি।
- সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র আলাদা করতে হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. সুস্থভাবে থাকতে হলে শরীরের ———————— নিতে হয়।
খ. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিষ্কার ———————— প্রয়োজন।
গ. পানীয় জল নিরাপদভাবে সংগ্রহ ও ———————— করতে হয়।
ঘ. জন্ডিস একটি ———————— রোগ।

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে কী কী বেরিয়ে যায় ?
(ক) লবণ ও আয়োডিন (খ) পানি ও রক্ত
(গ) পানি ও লবণ (ঘ) পানি ও ক্যালসিয়াম

২. ডায়রিয়া হলে রোগীকে নিচের কোনটি খাওয়াতে হবে?
(ক) দুধ (খ) শাক-সবজি
(গ) মাছ (ঘ) খাবার স্যালাইন

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর

বাম	ডান
খাবার স্যালাইন	মলমূত্রের সাথে বের হয়
কাঁচা ফলমূল	নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে
পেটের পীড়া	পানিবাহিত রোগ
আমাশয়	দূষিত পানি পান
টাইফয়েডের জীবাণু	ডায়রিয়া নিরাময়
	মলমূত্র ত্যাগ

সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. বাড়িতে কারো ডায়রিয়া হলে কী কী ব্যবস্থা নিবে ?
খ. কীভাবে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করবে ?
গ. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার পাঁচটি উপায় লিখ।
ঘ. আমাশয় রোগের দুটো লক্ষণ লিখ।
ঙ. পানির মাধ্যমে কীভাবে রোগ ছড়ায় তা ছবি এঁকে দেখাও।
চ. ১. কখন তুমি হাত ধুবে?

.....
.....

২. কীভাবে হাত ধুবে?
.....
.....

৩. হাত ধোয়া কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
.....
.....

অধ্যায়–৬

পদার্থ

তোমার চারপাশে যেসব বস্তু দেখতে পাও তা খেয়াল কর। তোমার পড়ার টেবিল, বই, তোমার জামা কাপড়, ধূলিকণা, গাছপালা, পাহাড়, পৃথিবী, সবই বস্তু। এছাড়া আছে গ্লাসে রাখা পানি ও বেলুনের বাতাস। এসব বস্তুর কোনোটি ক্ষুদ্র, কোনোটি বড়। কোনোটি শক্ত, কোনোটি নরম। কোনোটি ভারি কোনোটি বা হালকা। খেয়াল করি, এক এক বস্তুর এক এক চেহারা। কোনো কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট আকার আছে যেমন একখণ্ড ইট। কোনো কোনো বস্তুর আকার নির্দিষ্ট নয়। আয়তন নির্দিষ্ট। যেমন গ্লাসে রাখা পানি। গ্যাস সিলিন্ডারে যেটুকু গ্যাসই রাখ তা পুরো সিলিন্ডারই দখল করে। কারণ এর নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন নেই।

বিভিন্ন ধরনের পদার্থ

তোমার চারপাশে যে নানা রকম বস্তুর কথা বলা হলো তাদের মধ্যে যেগুলোর নির্দিষ্ট আকার আছে তার একটি তালিকা নিচের ছকে তৈরি কর:

তোমার চারপাশের বস্তুর নাম
১.
২.
৩.

আমাদের চারপাশের নানা বস্তু, এরা যা দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় পদার্থ। দেখতে ও বৈশিষ্ট্যে যতই ভিন্ন হোক সব পদার্থের ওজন আছে। সব পদার্থ স্থান দখল করে। পদার্থের এই

দুটি বৈশিষ্ট্য তুমি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পার। তাহলে পদার্থ কাকে বলে? যার ওজন আছে এবং যা স্থান দখল করে তাই পদার্থ।

কঠিন পদার্থ

মনে কর, একখন্ড পাথর বা একটি লোহার পেরেককে টেবিলে রাখলে এবং পরে একটি কাচের পাত্রে রাখলে। এদের আকার কি বদলে যাবে? কোন পাত্রে রাখা হলো বা কোথায় রাখা হলো তার ওপরে এদের আকার নির্ভর করে না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিলে এদের আয়তনও বদলায় না। এরা হলো কঠিন বস্তু। এরা কেন কঠিন বস্তু। কঠিন বস্তুর আকার, আয়তন ও ওজন আছে।

কঠিন পদার্থের ওজন পরীক্ষা

একটি কাঠের স্কেল নাও। একে দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে দাঁড় করাও। এই স্কেলের উপরে একটি পেরেক এমনভাবে ঢুকাও যা থেকে একটি রাবার ব্যান্ড ঝুলানো যায়। ব্যান্ডটিকে সোজা রাখার জন্য একটি হালকা ওজন ঝুলাও। ব্যান্ডটির অবস্থান নির্ধারণ কর। এবার যে বস্তুর ওজন মাপতে চাও তা হালকা সূতা দিয়ে রাবার ব্যান্ডের সঙ্গে বেঁধে দাও। ব্যান্ডের নিচ প্রান্তের নতুন অবস্থান নির্ধারণ কর। রাবার ব্যান্ডটি কতটা নিচে নেমে গেছে তা থেকে বস্তুটির ওজন পরিমাপ করতে পারবে। এইভাবে শুধু হালকা বস্তুর ওজন মাপতে পারবে। ভারী বস্তুর ওজন মাপতে হলে স্প্রিং নিক্তি ব্যবহার করতে পার। তুমি নিজেও স্প্রিং নিক্তি বানাতে পার।

স্প্রিং নিক্তি

তরল পদার্থের ওজন মাপা

পানি, দুধ, তেল এবং এ ধরনের পদার্থের নিজস্ব আকার নেই। এদেরকে তরল পদার্থ বলা হয়। তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ কোথাও রাখতে গেলে কঠিন পদার্থের মতো স্থির হয়ে থাকে না। গড়িয়ে চলে যায়।

নিক্তিতে যেমন ওজন করে দেখেছ কঠিন পদার্থের ওজন আছে। তরল পদার্থের বেলাতেও সেই পরীক্ষাটি করতে পার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি পাত্রে তরল পদার্থ রাখতে হবে এবং ঐ পাত্রসহ নিক্তিতে ওজন করতে হবে।

কঠিন পদার্থ জায়গা দখল করে

তরল পদার্থের ওজন আছে

কঠিন পদার্থ ও তরল পদার্থ জায়গা দখল করে।

এদের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি দেখাতে পার। একটি পাত্রকে কানায় কানায় পানিতে পূর্ণ কর। এবার একটি মারবেল বা লোহার টুকরো এতে ছেড়ে দাও। পানি উপচে পড়বে। পানিপূর্ণ পাত্রের নিচে যদি একটি থালা রাখ তাহলে উপচে পড়া পানি তুমি সংগ্রহ করতে পার। এই পানির আয়তন কত জান? মার্বেল বা লোহার খণ্ডটির আয়তনের সমান। পানি কেন উপচে পড়ল? আসলে লোহার খণ্ডটি যে জায়গা দখল করল সেখান থেকে পানি উপচে পড়েছে। তাহলে বুঝতে পারছ কঠিন পদার্থ যেমন স্থান দখল করে। তরল পদার্থও তেমনি জায়গা দখল করে।

বায়ু কী জায়গা দখল করে?

বলা হয়ে থাকে আমরা একটি বায়ুর সমুদ্রে বাস করছি। এ কথার অর্থ কি জান? আমরা দেখতে না পেলেও আমাদের চারপাশে যে স্থান সেখানে বাতাস আছে। আমরা যদিও ভুল করে ভাবি যেখানে কোনো কঠিন পদার্থ বা তরল পদার্থ নেই সে জায়গা শূন্য। একটি খালি গ্লাস বা বোতল দেখে মনে হতে পারে এর ভিতরটা শূন্য। কিন্তু সেখানে বায়ু আছে। বায়ু যে জায়গা দখল করে তার একটি পরীক্ষা করতে পার।

পরীক্ষা

একটি বোতল, একটি ফানেল ও কিছু আঠালো কাদামাটি নাও। ফানেলটি বোতলের মুখে ঢুকিয়ে বোতলের মুখে ফানেলের চারপাশে কাদামাটি লেপে দাও। এতে বাতাস বোতলে ঢুকতে পারবে না। এবার ধীরে ধীরে ফানেলে পানি ঢাল। পানি কি সহজভাবে বোতলের মধ্যে পড়বে? এবার

একটি সূচালো কাঠি দিয়ে ছোট্ট ছিদ্র কর কাদামাটির আবরণে। দেখবে, এই ফুটো দিয়ে বায়ু বের হয়ে আসছে এবং পানি আগের চেয়ে দ্রুত বোতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পার? বায়ু বোতলের মধ্যে জায়গা দখল করে ছিল বলে পানি প্রবেশ করতে পারছিল না। ছিদ্র পথে বায়ু বের হয়ে আসার ফলে যে জায়গা খালি হলো সেখানে পানি প্রবেশ করতে পারছে।

বায়ু যে জায়গা দখল করে তার আর একটি পরীক্ষা সহজেই করতে পার। একটি হালকা প্লাস্টিকের বোতল নাও। পানিশূন্য এমন একটি বোতলের মুখ ভালো করে বন্ধ কর। এবার চাপ দিয়ে দেখ বোতলটি চুপসে যাবে না। এবার বোতলের মুখটি খুলে দাও এবং বোতলের উপরে চাপ দাও। বোতলটি এবার সহজেই চুপসে যাবে। কারণ যাকে আমরা খালি বোতল বলছি তার মধ্যে আসলে বায়ু আছে। মুখ বন্ধ অবস্থায় চাপ দিয়ে বোতলের ভিতরের বায়ু বোতলের চুপসে যাওয়াকে বাধা দেয়। বোতলের মুখটি যখন খোলা হয় তখন চাপ দিলে ভিতরের বাতাস বের হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বোতলটি সহজেই চুপসে যায়।

বায়ু জায়গা দখল করে

বায়ুর কী ওজন আছে ?

বায়ুর যে ওজন আছে তা প্রমাণ করার জন্য একটি ফুটবল নাও যার ভিতরে বাতাস নেই। বলটিকে একটি নিক্তিতে ওজন কর যা সূক্ষ্মভাবে ওজন মাপতে পারে। পাম্পার ব্যবহার করে ফুটবলে বাতাস ঢুকাও। এবার ওজন নাও। ওজনের যে সামান্য পার্থক্য পাবে তা বাতাসের ওজন।

উপরের পরীক্ষাগুলো থেকে আমরা কী জানলাম–

কঠিন বস্তুর নির্দিষ্ট ওজন, আয়তন ও আকার আছে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ওজন ও আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই। গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট ওজন আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নেই। কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে অবস্থায়ই থাকুক সব পদার্থের ওজন আছে এবং সব পদার্থ জায়গা দখল করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. যার ওজন আছে এবং যা জায়গা দখল করে তাকে বলে ———।
খ. একখন্ড ইট একটি ——— পদার্থ।
গ. তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ——— নেই।
ঘ. বায়ু একটি ———।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

ক. সব পদার্থের আছে –
১) নির্দিষ্ট ওজন ও আয়তন ২) নির্দিষ্ট আয়তন
৩) নির্দিষ্ট ওজন ৪) ওজন ও আয়তন

খ. নিচের কোনটি তরল পদার্থ –
১) তেল ২) লবণ
৩) আটা ৪) চাল

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর।

বাম	ডান
কাঠ	তরল পদার্থ
দুধ	গ্যাসীয় পদার্থ
বায়ু	কঠিন পদার্থ
বালুকণা	প্লাস্টিক

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলো কী ?
খ. নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই এমন বস্তুকে কী বলে ?
গ. বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. বায়ু যে জায়গা দখল করে তা একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।
খ. কঠিন বস্তু যে জায়গা দখল করে তা কীভাবে প্রমাণ করবে।

অধ্যায়– ৭

প্রাকৃতিক সম্পদ

আমাদের প্রয়োজনে আমরা নানা জিনিস ব্যবহার করি। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাই, আশ্রয়ের জন্য ঘর বাড়ি তৈরি করি। পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি। এসব জিনিস কিছু আমরা সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাই। কিছু জিনিস আমরা তৈরি করি। এসো আমরা দেখি, আমাদের দরকারি জিনিসগুলো কোথা থেকে আসে?

দরকারি জিনিস কোথা থেকে আসে?

তোমরা চারটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি দল একটি সারি পূরণ কর।

দরকারি জিনিস	কোথায় পাওয়া যায়	কোথায় তৈরি/উৎপন্ন হয়	কী থেকে উৎপন্ন হয়
উদাহরণঃ ঘরে ব্যবহারের জিনিস– চামচ	বাজারে	কারখানায়	লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ থেকে
১.পড়ালেখার উপকরণ			
২.খাদ্যসামগ্রী			
৩. কাঁচা ঘর তৈরির সামগ্রী			
৪. যান বাহন ও কলকারখানা চলে কী পুড়িয়ে?			

এবার তোমাদের পাওয়া উত্তরগুলো আলোচনা কর। লেখাপড়া করার জন্য বই দরকার। বইয়ের জন্য কাগজ দরকার। কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে। আমরা কিছু গাছ লাগাই। তবে বেশিরভাগ গাছ বনে আপনা আপনি জন্মায়।

ভাত রান্না হয় চাল থেকে, চাল হয় ধান থেকে। ধান গাছ জন্মায় খেতের মাটিতে। মাটি কি আমরা তৈরি করেছি? মাটি প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে। মাছ পাওয়া যায় নদী, পুকুর, খাল–বিল, হাওড় ও সমুদ্রের পানিতে। পানিও প্রকৃতিতে তৈরি হয়েছে।

বাস বা লঞ্চ চলে পেট্রোল পুড়িয়ে। এই পেট্রোল পাই মাটির নিচ থেকে। কিছু গাড়ি চলে সিএনজি পুড়িয়ে। সি এন জি তৈরি হয় মাটির নিচে পাওয়া গ্যাস থেকে।

আমরা দেখলাম যে, কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে। আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয় পানি ও মাটিতে। মাটি ও পানি আমরা তৈরি করি না। বাস, লঞ্চ, গাড়ি, বিমান এগুলো যে তেলে বা গ্যাসে চলে তা–ও আমরা তৈরি করতে পারি না। গাছ, মাটি, পানি, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস এ সবই প্রকৃতিতে পাই। এভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যা কিছু আমরা কাজে লাগাই তাদের আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ বলি। তোমরা জানলে প্রকৃতিতে অনেক ধরনের সম্পদ পাওয়া যায়। এবার ভাবতো, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী আছে?

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী?

বাংলাদেশে প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদগুলো হলো পানি সম্পদ, ভূমি সম্পদ, বনজ সম্পদ, সৌরশক্তি, বায়ু ও খনিজ সম্পদ।

পানি সম্পদ: আমরা নানাভাবে পানি ব্যবহার করি। আমরা পানি পান করি। পানিতে গোসল করি, কাপড় চোপড় ধুই। শিল্প কারখানায়ও আমরা প্রচুর পানি ব্যবহার করি। এই পানি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তাই পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। নিচের চিত্রগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর। চিত্রগুলো থেকে বের করো বাংলাদেশে পানি কোথায় পাওয়া যায়? এবং পানি কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

নদী

ঝরনা

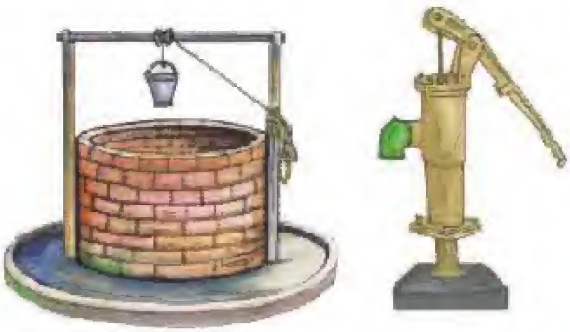

পানির উৎস

ধানক্ষেতে পানি সেচ

ভূমিসম্পদ

পানিতে মাছ ধরা

তোমরা মাটি সম্পর্কে জেনেছ। মাটিতে আমরা ফসল ফলাই, গাছ লাগাই। ধান, গম, সবজি এ জাতীয় ফসল থেকে আমরা খাদ্য পাই। পাট, তুলা এ ধরনের ফসল থেকে আমরা সুতা, দড়ি, চট এসব তৈরি করি।

মাটির তৈরি ঘর দেখেছ কি? গ্রামে অনেক ঘরের মেঝেই মাটির তৈরি। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি করা হয়। তারপর ইট দিয়ে দালান, রাস্তা, দেয়াল এগুলো তৈরি হয়। ইটের সাথে আরও দরকার হয় বালি, সিমেন্ট এগুলো। বালি পাওয়া যায় মাটি বা ভূমি থেকে। তাই ভূমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।

খনিজসম্পদ

আরেক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ হলো খনিজ সম্পদ। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজ সম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা উপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানী হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার দরকারি দ্রব্যও তৈরি করা হয়।

যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন ও প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি করা হয়।

পেট্রোল পুড়িয়ে গাড়ি চলে

প্রাকৃতিক গ্যাসে রান্না

প্রকৃতিতে দরকারি আরও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। গাড়ি, বাস, জাহাজ এগুলো তৈরি হয় লোহা থেকে। টিটবাওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক, যন্ত্রপাতি এগুলোও তৈরি লোহা থেকে। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাড়ি পাতিল, চামচ তৈরি হয় এ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো এ্যালুমিনিয়াম, কাঁসা, পিতল, তামা, রুপা, সোনা এসব দরকারি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। এদের সবগুলোই খনিজ সম্পদ। বাংলাদেশে এসব খনিজ সম্পদ বেশি পরিমাণে নেই। তবে বাংলাদেশে চুনাপাথর মোটামুটি পরিমাণে পাওয়া যায়। চুনাপাথর সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

বনজ সম্পদ

বনের গাছ থেকে আমরা কী পাই? পাশের চিত্রটি দেখ:

উদ্ভিদ থেকে আমরা কী কী পাই

বায়ুসম্পদ

শিক্ষকের নির্দেশনায় একটি চরকা তৈরি কর। এবার চরকাটি যেদিক থেকে বাতাস আসছে তার দিকে ধর। বায়ু প্রবাহিত না হলে এটিকে সামনে ধরে দৌড় দাও। দেখবে চরকাটি ঘুরছে। এভাবে বায়ু প্রবাহকে ব্যবহার করে বড় চরকা বা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে ফসল ঝেড়ে ময়লা দূর করা হয়।

বায়ুপ্রবাহে ধান উড়িয়ে ময়লা দূর করছেন একজন নারী

বায়ু চালিত টারবাইন

এভাবে প্রকৃতির বায়ুপ্রবাহকে আমরা কাজে লাগাই। তাই বায়ুপ্রবাহ প্রাকৃতিক সম্পদ।

সৌর শক্তি

সৌরশক্তি আরেকটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো ও তাপ আসে। সূর্য থেকে পাওয়া রোদকে ব্যবহার করে আমরা ভেজা কাপড় শুকাই। রোদে আমরা ধান ও অন্য ফসল শুকিয়ে সংরক্ষণ করি। সূর্যের আলোকে সৌর প্যানেলের সাহায্যে সংগ্রহ করে আমরা তাপ পেতে পারি। আবার সূর্যের আলো সংগ্রহ/আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে এখন এ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

এতক্ষণ তোমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে জানলে। এবার ভাবো, এদের সবগুলোর সরবরাহ কি অফুরন্ত ? এগুলো কি নবায়নযোগ্য যা কখনো ফুরাবে না? না এদের সরবরাহ সীমিত, একসময়ে ফুরিয়ে যাবে? এসো এবার আমরা একটি কাজ করি। এই ছয় ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিচের ছকে দুটি ভাগে ভাগ করি।

নবায়নযোগ্য বা সরবরাহ অফুরন্ত, কখনো ফুরাবে না	অনবায়নযোগ্য বা সরবরাহ সীমিত, যা একসময়ে ফুরিয়ে পাবে

উপরের ছকটি পূরণ হলে আমরা দেখব যে, খনিজ সম্পদ নবায়নযোগ্য নয়। এগুলোর পরিমাণ সীমিত। এগুলো ব্যবহার করতে থাকলে একসময় ফুরিয়ে যাবে। যেমন, আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। এ গ্যাস যদি বেহিসেবি পুড়িয়ে ফেলি তাহলে এক সময় এ গ্যাস শেষ হয়ে যাবে। তখন এ গ্যাস দরকারি কাজে ব্যবহার করা যাবে না । তাই বিনা কারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা উচিৎ নয়।

পানি, মাটি, বনজসম্পদ, বায়ু ও সৌরশক্তি এ সবগুলোই নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে ব্যবহার উপযোগী পানি ও চাষযোগ্য ভূমি সীমিত। তাই পানিও অযথা খরচ করা ঠিক নয়। আবার পানিকে দূষিত করা ঠিক নয়। মাটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় না।

বাংলাদেশে যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন করে গাছ লাগানো হচ্ছে না। বন কমে গেলে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়।

আমরা বায়ু সম্পদ ও সৌরশক্তি যত ইচ্ছা তত ব্যবহার ও উৎপাদন করতে পারি। এতে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সাধারণ কিছ কৌশল আছে। তিনটি কৌশলের কথা বলা যায়। তা হলো– কম ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার এবং পুনরুৎপাদন। নিচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কম ব্যবহার: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রথম কৌশল হচ্ছে তা কম ব্যবহার করা। যেমন জ্বালানি কম ব্যবহার করা। কীভাবে আমরা জ্বালানির ব্যবহার কমাতে পারি? আমরা এসি ব্যবহার না করে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারি। প্রয়োজন শেষে সাথে সাথে বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব এগুলো বন্ধ করে বিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারি। বিদ্যুতের ব্যবহার কমলে কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমবে। কেবল রান্নার প্রয়োজনেই গ্যাসের চুলা ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহারের সাথে সাথে চুলাটি বন্ধ করা উচিত। কোনোভাবেই জামা কাপড় শুকানোর কাজে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করা ঠিক নয়।

পুনর্ব্যবহার:

একটি জিনিসকে পুনরায় ব্যবহার করে আমরা সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারি। নিচের কাজটি থেকে আমরা দেখবো কীভাবে একটি জিনিসকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

কীভাবে আমরা কোন কিছুকে পুনঃব্যবহার করি?

তোমরা যে খাতায় লেখ তা অনেক সময় ফেরিওয়ালারা কিনে নিয়ে যায়। এই কাগজ দিয়ে কী করা হয়? এসো আমরা একটি জিনিস বানাই।
যা যা লাগবে: দুই টুকরা কাগজ, আঠা

এবার শিক্ষকের নির্দেশনায় কাগজের ঠোঙাটি তৈরি কর।

এবার কাগজের ঠোঙা কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। কাগজের মতো অন্যান্য জিনিসও ফেলে না দিয়ে আমরা পুনরায় নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি।

পুনরুৎপাদন: তোমরা দেখেছ ফেরিওয়ালারা টিনের কৌটা, এ্যালুমিনিয়ামের ভাঙা হাড়ি পাতিল, পুরনো লোহা ও কাঁচের জিনিস কিনে নেয়। এগুলো দিয়ে কী করা হয় বলতে পারো? পুরনো কাঁচ গলিয়ে নতুন কাঁচের সাথে মিশিয়ে কাঁচের জিনিস তৈরি করা হয়। একইভাবে পুরনো লোহা, এ্যালুমিনিয়াম, টিন এগুলো গলিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করা যায়। এতে লোহা, এ্যালুমিনিয়াম, টিন এগুলোর আকরিক খনি থেকে কম তোলা হয়। এভাবে খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ হয়।

এ অধ্যায় থেকে শিখলাম

এ অধ্যায়ে প্রথমে আমরা জানলাম প্রাকৃতিক সম্পদ কী? তারপর আমরা জানলাম বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো হলো– পানিসম্পদ, ভূমিসম্পদ, খনিজসম্পদ, বনজসম্পদ, সৌরশক্তি ও বায়ুসম্পদ। আমরা সবশেষে জানলাম প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা ঠিক নয়।

এগুলো কম ব্যবহার করে, পুনরায় ব্যবহার করে এবং পুনরুৎপাদন করে সংরক্ষণ করতে পারি। তাহলে এ সম্পদগুলো ফুরিয়ে যাবে না বা নষ্ট হয়ে যাবে না।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও

ক. বাংলাদেশে কোন খনিজ সম্পদটি বেশি পাওয়া যায়?
১) লোহা ২) অ্যালুমিনিয়াম ৩) তামা ৪) চুনাপাথর

খ. কোন সম্পদটি নবায়নযোগ্য নয়?
১) গাছ ২) পানি ৩) বায়ুসম্পদ ৪) প্রাকৃতিক গ্যাস

গ. নবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে কী বোঝায়?
১) সম্পদটি নতুন করে তৈরি করা যায় ২) সম্পদটি সীমিত
৩) সম্পদটি কখনোই ফুরাবে না ৪) সম্পদটি মূল্যায়ন

ঘ. কী করলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় না?
১) জৈব সার ব্যবহার করলে ২) একই ফসল বুনলে
৩) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল বুনলে ৪) কোনোটি নয়

ঙ. কী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ হবে?
১) সৌরশক্তি ২) কয়লা ৩) প্রাকৃতিক গ্যাস ৪) পেট্রোলিয়াম

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর

বাম	ডান
গাছ	ভূমি সম্পদ
নদী	বনজ সম্পদ
সৌরশক্তি	পানি সম্পদ
মাটি	নবায়নযোগ্য

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝ ?
খ. পানি সম্পদ আমরা কীভাবে কাজে লাগাই তা লিখ।
গ. বায়ুসম্পদকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি ?
ঘ. আমাদের দেশে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে। অন্য কী কী ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ হবে।
ঙ. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে রান্না না করে আর কী কী কাজে ব্যবহার করা ভালো।
চ. বনজ সম্পদ আমাদের কী কী কাজে লাগে ?
ছ. একটি উদাহরণের সাহায্যে সম্পদের পুনর্ব্যবহার ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়–৮

মহাবিশ্ব

তুমি কি বিভিন্ন সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছ?

সূর্যাস্তের ও সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখেছ?

দিনের বিভিন্ন সময় সূর্যের অবস্থান খেয়াল কর। রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণ করা মানে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা। আকাশের মতো বিস্ময় ও আকর্ষনীয় আর কিছু তুমি খুঁজে পাবে না। দিনের বেলাতে উজ্জ্বল সূর্যের আলোর জন্য আকাশের অন্য সব আলোকিত বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু মেঘমুক্ত রাতের আকাশের দিকে তাকালে হাজার হাজার উজ্জ্বল বস্তু দেখতে পাবে খালি চোখে। বাইনাকুলার বা দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখলে অনেক বেশি সংখ্যক উজ্জ্বল বস্তু তুমি দেখতে পাবে। এগুলোই জ্যোতিষ্ক।

নক্ষত্রপুঞ্জ

এদের মধ্যে রয়েছে গ্রহ ও নক্ষত্র। গ্রহের নিজস্ব আলো নেই। সূর্য থেকে আলো পায় বলে এদেরকে আলোকিত দেখায়। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে মোট আটটি গ্রহ বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে। কোনো কোনো গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে। যেমন পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ হলো চাঁদ।

খালি চোখে দেখলে সূর্য ছাড়া অন্য নক্ষত্রগুলো আলোর বিন্দুর মতো মনে হয়। সূর্যকে এতো উজ্জ্বল মনে হয় কারণ অন্যসব নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য পৃথিবীর অনেক কাছে। খালি চোখে বা দূরবীনে যে অসংখ্য নক্ষত্র আলোক বিন্দু রূপে আমরা দেখতে পাই তারা আসলে বিশাল সব নক্ষত্র। এদের মধ্যে সূর্যের চেয়ে বড় এবং সূর্যের চেয়ে ছোট নক্ষত্র রয়েছে।

মহাবিশ্ব অনেক বড়

এমন নক্ষত্রও দেখা গেছে যেখান থেকে আলো আসতে শত কোটি বছর সময় লাগে। আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে। তাহলে বুঝতে পারছো, মহাবিশ্ব কত বড়!

নক্ষত্রগুলো যদিও পরস্পর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এক একটি বড় সমাবেশে গড়ে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র থাকে। এই বড় সমাবেশকে বলে গ্যালাক্সি। মহাবিশ্বে এমন গ্যালাক্সির সংখ্যা অনেক। এক একটি গ্যালাক্সির মধ্যে নক্ষত্রগুলো আবার গুচ্ছ গুচ্ছ রূপে সাজানো থাকে। এরা হলো নক্ষত্র মণ্ডল। আমাদের সূর্য যে গ্যালাক্সির সদস্য তার নাম ছায়াপথ। নক্ষত্রদের মধ্যবর্তী স্থানে নানা ধুলিকণা ও গ্যাস মেঘ সৃষ্টি করে আছে। একে বলা হয় নীহারিকা। নীহারিকা, গ্যালাক্সি ও এদের মধ্যবর্তী স্থান নিয়ে যে বিশাল জগত তাকেই আমরা বলি মহাবিশ্ব।

গ্যালাক্সি : মিল্কিওয়ে

ধুমকেতু

সৌরজগৎ

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানী এটা প্রমাণ করেছেন যে, আসলে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এর কক্ষপথে ঘুরছে। সেই সঙ্গে পৃথিবী আপন অক্ষের উপরে পাক খাচ্ছে। সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। একে আমরা এক বছর বলি। পৃথিবী এর নিজ অক্ষের উপরে এক বার ঘুরে উঠতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। এর ফলে দিন রাত্রি হয়। সূর্যের আলো পৃথিবীর যে পৃষ্ঠে পড়ে সেখানে দিন হয়। যে অংশে সূর্যের আলো পৌঁছে না সেই অংশে রাত্রি হয়। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে দিকে পাক খাচ্ছে ফলে আমাদের কাছে মনে হয় সূর্য পূর্ব উঠছে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে।

অন্ধকার ঘরে একটি মোমবাতি জ্বালাও এবার একটি বল যা গ্লোবকে মোমবাতির সঙ্গে একই সমতলে রেখে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরাও। খেয়াল করে দেখ বলের উপরে যেখানে আলো

পড়ছে তা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। শিক্ষকের সহায়তায় এই পরীক্ষাটি করতে পার। সূর্য ও সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু, উল্কা ও অন্যান্য নানা বস্তু নিয়ে যে পরিবার তাকে আমরা বলি সৌরজগৎ। সূর্য এই সৌরজগতের কেন্দ্র বিন্দু। সূর্য পৃথিবীর তুলনায় প্রায় তিনলক্ষগুণ ভারী। এর কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রচণ্ড। আসলে সূর্য মহাশূন্যে এর সমস্ত সদস্য নিয়ে পরিভ্রমণ করছে।

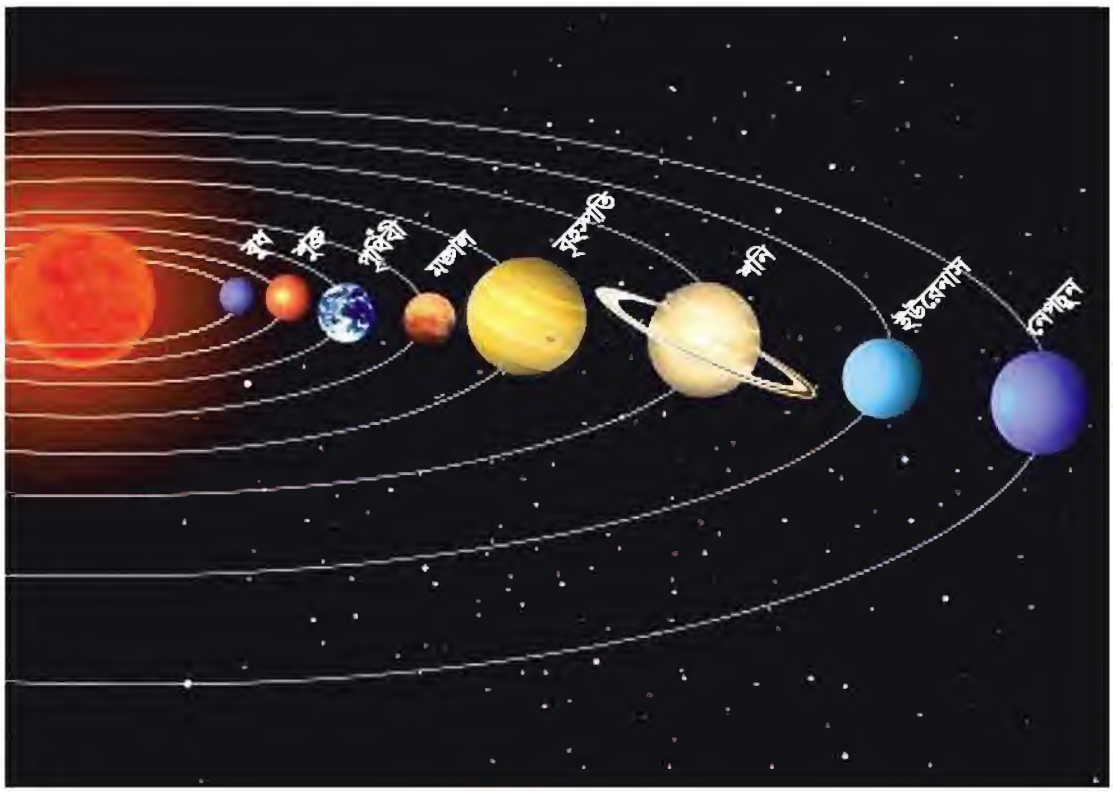

সৌরজগৎ

উপরের ছবিতে দেখ সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ ঘুরছে।

বৃহস্পতি: সবচেয়ে বড় গ্রহ

কাজ : একজন শিক্ষার্থীকে সূর্য এবং আটজন শিক্ষার্থীকে আটটি গ্রহের নাম দাও। অতপর সূর্যকে কেন্দ্র করে ক্রম অনুযায়ী আটটি গ্রহ আট কক্ষপথে ঘুরবে।

আসলে তোমরা নিজেরাও এমন খেলার আয়োজন করতে পার যা সূর্যকে ঘিরে গ্রহের ঘোরার মতো। একটি বল বা পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঘুরাও। সুতার টানে পাথরটি বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। তুমি ভাবছো গ্রহগুলোতে কোনো সুতা দিয়ে বাঁধা নেই সূর্যের সঙ্গে। আসলে একটি আকর্ষণ বল প্রতিটি গ্রহ ও সূর্যের মধ্যে কাজ করে।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ ঘোরে বলে চাঁদকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ। অন্যান্য অনেক গ্রহের উপগ্রহ আছে। এক সময় সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্লুটোকেও গ্রহ মনে করা হতো। সূর্যের সবচেয়ে কাছে হল বুধ গ্রহ, এরপর শুক্র, এরপর পৃথিবী এরপর মঙ্গল। উপরের ছবিতে গ্রহগুলোর অবস্থান লক্ষ কর।

নিউটন

কোপারনিকাস

আমরা বাস করি পৃথিবী নামক গ্রহে। পৃথিবী হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবন সম্ভব হয়েছে। জীবনের বিকাশের জন্য পানি, মাটি, বায়ু, তাপ, আলোসহ প্রয়োজনীয় উপাদান একমাত্র পৃথিবীতেই আছে।

পৃথিবী

তুমি নিশ্চয়ই রাতের আকাশ দেখেছো–

সূর্যের পরেই আকাশের যে উজ্জ্বল বস্তু আমাদের চোখে পড়ে রাতে তা হলো চাঁদ। চাঁদের আলো অনেক স্নিগ্ধ। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হয়ে একে উজ্জ্বল করে। প্রতি রাত্রে যদি চাঁদ দেখ, দেখবে চাঁদের আকার বদলে যাচ্ছে। পূর্ণিমার চাঁদ সবচেয়ে বড়, পূর্ণ থালার মতন। এরপর চাঁদ ক্রমাগত ছোট হতে থাকে। প্রতিদিন চাঁদের ছবি নিয়ে বা ছবি এঁকে দেখলো সাদাও। দেখবে চৌদ্দদিন পর পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা এবং চৌদ্দদিন পর নতুন চাঁদ থেকে পূর্ণিমা দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায়ও আকাশ দেখতে পার। কিন্তু মনে রাখবে সূর্যের দিকে সরাসরি তাকানো ঠিক নয়।

অনুশীলন

শূন্যস্থান পুরণ কর

ক) আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু হলো———।
খ) রাতের উজ্জ্বল তারাগুলো ——— জন্য দিনে দেখা যায় না।
গ) পৃথিবী একটি ———।
ঘ) চাঁদ পৃথিবীর ———।
ঙ) সূর্যের চেয়ে বড় ও সূর্যের চেয়ে ছোট অনেক ——— আছে আমাদের গ্যালাক্সিতে।
চ) সৌর জগতে আটটি ——— আছে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

ক. সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা কতটি?
১) ৭টি ২) ৮টি
৩) ৯টি ৪) ১০টি

খ. সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি?
১) বুধ ২) শুক্র
৩) পৃথিবী ৪) মঙ্গল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এই ধারণা সৃষ্টিতে কোন কোন বিজ্ঞানীর অবদান আছে?
খ. সৌর জগতের সদস্য এমন তিন ধরনের বস্তুর নাম লিখ।
গ. নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য কী ?
ঘ. সূর্য থেকে আমরা কী পাই ?
ঙ. চাঁদের আলো স্নিগ্ধ কেন ?
চ. গ্যালাক্সি কী ?
ছ. কত দিনে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ?

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর

বাম	ডান
পৃথিবী	নক্ষত্র
সূর্য	উপগ্রহ
চাঁদ	গ্যালাক্সি
ছায়াপথ	ধূমকেতু

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. রাতে অনেক তারা দেখা যায় কিন্তু দিনে এগুলো দেখা যায় না কেন ?
খ. সূর্যের চেয়ে বড় নক্ষত্র আছে কিন্তু সেগুলো উজ্জ্বল দেখা যায় না কেন ?
গ. সৌরজগতে আটটি গ্রহ আছে কিন্তু শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে কেন ?
ঘ. মহাবিশ্ব বলতে কী বোঝ ?
ঙ. মহাবিশ্ব যে বিশাল তা আমরা কেমন করে জানি।

প্রকল্পমূলক কাজ

ক. সৌর জগতের একটি মডেল তৈরি কর।

অধ্যায়–১

আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

তুমি কি খেয়াল করেছ মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের জীবন যাপনের মধ্যে কত পার্থক্য? আমরা গৃহে বাস করি। কাপড় পরি। খাদ্য উৎপাদন করি। অসুখ হলে ওষুধ খাই। খেলাধুলার জন্য নানা সামগ্রী ব্যবহার করি। সখ করে বাগান তৈরি করি। চিঠি ও টেলিফোনে খবর পাঠাই বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে। তাদের কাছ থেকে খবর পাই। একইভাবে রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্র আমাদের জীবনযাপনকে ভিন্ন করেছে অন্য প্রাণীদের জীবন থেকে।

মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীদের এই পার্থক্যের মূল কারণ কী জান?

মানুষ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে বলে সে তার পরিবেশ নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যন্ত্র উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে প্রযুক্তি।

বাসস্থানে প্রযুক্তি

তোমার বাসগৃহের কথা ভেবে দেখ। এখানে কী কী প্রযুক্তি আছে? মানুষ এক সময় গুহায় বাস করতো। গাছতলায় আশ্রয় নিত। খাবারের সন্ধানে ক্রমাগত স্থান বদল করতো। খাদ্য উৎপাদন করার কৌশল যখন মানুষ লাভ করলো তখন স্থায়িভাবে বাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ ও হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গৃহ নির্মাণ করতে শিখল। বাঁশের খুঁটি, পাতার ছাউনি এবং মাটি বা ডালপালার সাহায্যে দেয়াল তৈরি করে মানুষ ঘর বানাত। এরপর টিনের ছাদ, কাঠ ও ইট-পাথরের দেয়াল বানাল। আলো বাতাস যাতে ঘরে প্রবেশ করতে পারে সে জন্য জানালা উদ্ভাবন করল। এরপর কাদা মাটিকে ছাঁচে ফেলে খণ্ড খণ্ড রূপ দেয়া হলো এবং তা আগুনে পুড়িয়ে ইট তৈরি করা হলো। পাথরের বিকল্পরূপে ইট ব্যবহৃত হলো গৃহনির্মাণে।

খড়ের ঘর টিনের ঘর দালান

কাজ: তোমার বাড়িতে যে সব প্রযুক্তি ব্যবহার কর তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়িতে নানা রকম সুবিধা রয়েছে। প্রযুক্তির নানা প্রয়োগ তুমি এখানে দেখতে পাও। বৈদ্যুতিক বাতি। পানির সরবরাহ। বৈদ্যুতিক পাখা। রান্নার জন্য গ্যাসের চুলা বা বৈদ্যুতিক হিটার। ইলেকট্রনিক নানা যন্ত্র যেমন রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থা। উঁচু তলায় সহজে ওঠার জন্য সিঁড়ির পাশাপাশি লিফট ব্যবহার হয়। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য রিফ্রিজারেটর ব্যবহার করা হয় আধুনিক প্রযুক্তির অংশ রূপে।

বাড়িতে ব্যবহৃত নানা প্রযুক্তি

কাজ : একটি বাড়ির মডেল তৈরি কর।

চিকিৎসায় প্রযুক্তির ব্যবহার

তুমি কি কখনো অসুস্থ হয়েছ? তোমার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের কখনো অসুখ হয়েছে? ডাক্তারকে চিকিৎসা করতে দেখেছ?

ডাক্তার চিকিৎসায় জন্য নানা ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেন। এর মধ্যে রয়েছে থার্মোমিটার। থার্মোমিটার দিয়ে রোগীর শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়। স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয় হৃদযন্ত্রের কম্পন মাপার জন্য। শরীরের কোনো অংশের হাড় ভেঙ্গে গেলে এক্স–রে তে ধরা পড়ে। রোগীকে কখনো কখনো স্যালাইন দেওয়া হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে দেহের ভিতরের নানা অঙ্গের ছবি ডাক্তার নিয়ে থাকেন। একে বলা হয় আল্ট্রাসনোগ্রাফি। আধুনিক চিকিৎসায় এমন অনেক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। আগে মানুষ নানা সংক্রামক রোগে ও মহামারীতে অল্প বয়সেই মারা যেত। এখন উন্নত চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রচলন

হয়েছে। এর জন্য কৃতিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও নতুন সব প্রযুক্তির উদ্ভাবন। তুমি কি প্রতিষেধক টিকা নিয়েছ? তোমার সহপাঠিদের সঙ্গে আলাপ করবে প্রতিষেধক টিকা সম্পর্কে।

চিকিৎসায় প্রযুক্তির ব্যবহার

খেলাধুলা ও বিনোদন প্রযুক্তি :

খেলাধুলার জগতে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার তুমি দেখতে পাবে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন খেলার জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। তুমি যে ফুটবল ব্যবহার কর তা নির্মাণে উন্নতমানের চামড়া বা কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন বস্তু প্রয়োজন। ক্রিকেট খেলার ব্যাট, প্যাড, স্ট্যাম্প, কার্পেট সবই প্রযুক্তির ফসল। লন টেনিস, টেবিল টেনিস, পোল ভল্ট, তীর নিক্ষেপ ও সুটিং প্রতিযোগিতা সব কিছুতেই যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা প্রযুক্তির ফসল। কম্পিউটার গেম নতুন এক খেলার জগৎ সৃষ্টি করেছে। এই খেলার মাধ্যমে শিশুরা তাদের বুদ্ধির বিকাশ ও নৈপুণ্য দেখাতে পারে।

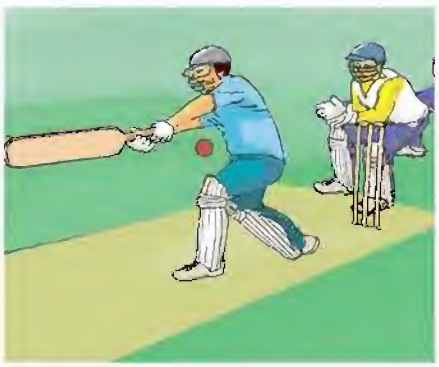

বিনোদনে প্রযুক্তি

খেলাধুলায় প্রযুক্তি

পড়াশুনা ছাড়া অবসর সময়ে কী কর? নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক নানা কাজে অংশ নাও। বিনোদনে প্রযুক্তির ব্যবহার তুমি দেখতে পাবে নানা যন্ত্রের ব্যবহারে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম, সিডি প্লেয়ার গিটার, তবলা, ইত্যাদি প্রযুক্তি বিনোদনে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিতে প্রযুক্তি

কৃষিতে প্রযুক্তির নানা ব্যবহারের কথা জেনেছ। কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় প্রভাব আমরা দেখতে পাই উন্নতমানের ধান, গম, আলু ইত্যাদি উৎপাদন। খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও দৈনন্দিন কাজে ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন সব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। নানা রং এর ফুল একই গাছে ফোটানো সম্ভব। কলম দেওয়া বা গ্রাফটিং, ক্লোনিং এগুলো সবই কৃষিপ্রযুক্তি।

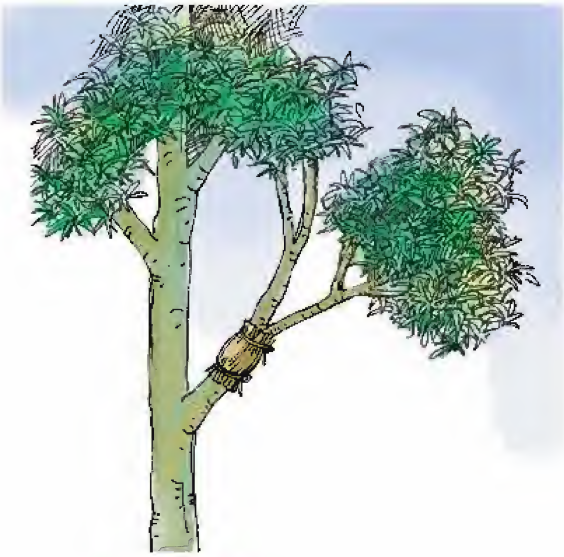

গাছে কলম করা

বাউকুল

কৃষি প্রযুক্তির একটি বড় অবদান হলো বনজ ও সৌন্দর্য বর্ধক নানা উদ্ভিদের চাষ। ফুলের বাগান সৃষ্টি। গোলাপ, গাদা, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, বাগানবিলাস, এসব শুধু আনন্দের ও সৌখিনতার উপকরণ নয়। এ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জিত হতে পারে।

তোমার বাড়ির আঙ্গিনায় অথবা স্কুল প্রাঙ্গণে দলগতভাবে ফুলের বাগান তৈরি কর। যাদের বাগান করার জায়গা নেই তারা টবে নানা রকম ফুলের গাছ বুনতে পার।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. অন্য প্রাণী থেকে মানুষ ভিন্ন কারণ মানুষ ——— ব্যবহার কর।
খ. ——— আমরা অন্যের সাথে বিনিময় করি।
গ. প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ——— নিয়ন্ত্রণ করি।
ঘ. মানুষ ——— উৎপাদন করতে শিখার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করল।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

ক. প্রযুক্তি ব্যবহার করে–
১) মানুষ ও প্রাণী
২) শুধু উন্নত দেশের মানুষ
৩) শুধু আধুনিক মানুষ
৪) সকল মানুষ

খ. প্রযুক্তির উদাহরণ–
১) নদী
২) ডানামেলা পাখি
৩) লোহা
৪) লোহার কাস্তে

গ. পরিবেশের উপর প্রযুক্তির প্রভাব–
১) সবসময় ভালো
২) সবসময় খারাপ
৩) ভালোমন্দ নির্ভর করে প্রয়োগের উপর
৪) ভালো বা মন্দ কোনোটাই নয়

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর।

বাম	ডান
কৃষি প্রযুক্তি	দালান
চিকিৎসা প্রযুক্তি	থার্মোমিটার
গৃহনির্মাণ প্রযুক্তি	কম্পিউটার
খেলাধুলা প্রযুক্তি	ফসল কাটার যন্ত্র
	ক্রিকেট বল

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. মানুষ কেন তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ?
খ. ঝড়–বৃষ্টি ও রোদ থেকে রক্ষা পেতে মানুষ কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে ?
গ. তোমার বাড়িতে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি প্রযুক্তির নাম লিখ।
ঘ. রোগী দেখার সময় ডাক্তার কী প্রযুক্তি ব্যবহার করেন ?
ঙ. খেলাধুলায় ব্যবহৃত দুটি প্রযুক্তির নাম লেখ।
চ. সৌন্দর্য বর্ধক দুটি উদ্ভিদের নাম লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা ভিন্ন কেন তা ব্যাখ্যা কর।
খ. প্রাচীন প্রযুক্তির সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মূল পার্থক্য কী ?
গ. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি না থাকলে আমাদের কী কী অসুবিধা হতো ?

তুমি নিজেই বানাতে পার – এমন একটি প্রযুক্তি বর্ণনা কর।

অধ্যায়–১০

আবহাওয়া ও জলবায়ু

নিচের ছবিগুলোতে কী দেখতে পাচ্ছ? প্রথম ছবিতে রোদ উঠেছে। দ্বিতীয় ছবিতে দেখছ বৃষ্টি পড়ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। আমরা দেখি আকাশের অবস্থা সবসময় পাল্টায়। এক রকম থাকে না, পরিবর্তন হয়।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিন

মেঘ-বৃষ্টির ছবি

গরম কালে খুব গরম লাগে। আমরা ঘামাতে থাকি। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। শীতকালে শীত পড়ে। শীতকালে আমাদের ত্বক বেশ শুষ্ক থাকে।

শীতকালে আর কী দেখ? কখনো কখনো সারাদিন কুয়াশায় ঢাকা। সূর্যকে দেখা যায় না। দুপুরেও শীত কমে না।

তোমার আশেপাশে গাছ আছে? খেয়াল করে দেখতো পাতা নড়ছে কি না? বলতো গাছের পাতা কেন নড়ে? গাছের পাতা নড়ে বায়ুর প্রবাহের কারণে। আমরা দেখি যে, কোনো সময় গাছের পাতা একদম নড়ে না। তখন আমরা বলি বায়ু বইছে না। আবার কোনো সময় দেখি গাছের পাতা খুব নড়ছে। আমরা তখন বলি যে, জোরে বাতাস বইছে। কোনো সময় আমরা আবার দেখি বাতাসে গাছের ডাল নুয়ে যায়। জোর বাতাসে ডালপালা ভেঙে যায়। গাছ ভেঙে পড়ে। কখনো ঘর-বাড়ি ভেঙে যায়। তোমরা কি এমনটা দেখেছ কখনো? আমরা এরকম অবস্থাকে ঝড় বলি।

বর্ষাকালে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখি দক্ষিণ দিক থেকে। আবার শীতকালে বায়ু প্রবাহিত হয় উত্তর দিক থেকে।

প্রচন্ড কুয়াশায় ও শীতে চাদর গায়ে দিয়ে আছে মানুষ

আমরা এতক্ষণ কয়েকটি অবস্থার কথা জানলাম। কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি। কখনো গরম, কখনোবা শীত। আবার কখনো মেঘ, কখনোবা কুয়াশা। কখনো বাতাস বয় না। কখনোবা খুব জোরে বাতাস বয়। বাতাস আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত হয়। বাতাসকে কখনো আমাদের শুকনো মনে হয়, কখনো ভেজা মনে হয়। কোনো জায়গার রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুপ্রবাহ এ অবস্থাগুলো মিলে হলো আবহাওয়া। এই অবস্থাগুলো অল্প সময়ের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে। আবার একই সময়ে দুটি কাছাকাছি জায়গার আবহাওয়া আলাদা হতে পারে। যেমন, তোমার বিদ্যালয়ে যখন বৃষ্টি হচ্ছে তখন তোমার বাড়িতে রোদ থাকতে পারে।

ঝড়

আবহাওয়ার উপাদান

আবহাওয়া কী তা আমরা জেনেছি। আমরা কোনো জায়গার আবহাওয়ার অবস্থাকে রোদ, মেঘ ও বৃষ্টি দিয়ে প্রকাশ করি। তাপমাত্রা দিয়ে বোঝা যায় গরম না শীত পড়েছে। বায়ু কতটা শুষ্ক বা ভেজা তা প্রকাশ করা হয় আর্দ্রতা দিয়ে। বায়ুপ্রবাহকে বর্ণনা করি বায়ু কতটা জোরে বইছে এবং কোন দিক থেকে বইছে। আকাশের অবস্থা, বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহ আবহাওয়ার একেকটি উপাদান। নিচে আবহাওয়ার কয়েকটি উপাদানের ছবি দেওয়া হলো।

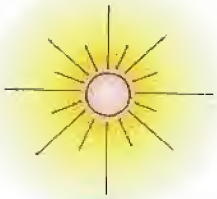

সূর্য

মেঘ

বৃষ্টি

বায়ুপ্রবাহ

তোমরা বাড়িতে আরেকটি কাজ করবে। রেডিও বা টেলিভিশনের খবর শুনবে। খবরের শেষদিকে মন দিয়ে আবহাওয়ার খবর শুনবে। বোঝার চেষ্টা করবে, আবহাওয়ার খবরে কী কী থাকে ? ওপরের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখবে কোন উপাদানগুলি মিলে যাচ্ছে।

আবহাওয়া কী প্রতিদিন পাল্টায় ?

এসো আমরা নিজেরাই দেখি আবহাওয়া প্রতিদিন পরিবর্তন হয় না ?

একটি দল গঠন কর। একজনের খাতায় নিচের তালিকা অনুযায়ী একটি ছক তৈরি কর।

ছক–১: পরপর পাঁচদিন দুপুর একটায় পাওয়া আবহাওয়ার উপাদানগুলোর তথ্য

আবহাওয়ার উপাদান	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন
তাপমাত্রা					
মেঘ ও রোদ					
বায়ুপ্রবাহ কতটা শক্তিশালী					
বায়ুপ্রবাহের দিক					
বৃষ্টি					

- নির্ধারিত সময়ে থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে নির্ধারিত ঘরে লিখ।
- নির্ধারিত সময়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ মেঘমুক্ত নীল আকাশ না মেঘ আছে ? মেঘ থাকলে হালকা না ঘন, পেজা তুলোর মতো না কালো ? কড়া রোদ না হালকা মিষ্টি রোদ ? যা দেখছো তা সংক্ষেপে নির্ধারিত ঘরে লিখ।
- বিদ্যালয়ের পতাকা ও গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে দেখ, পতাকা ও গাছের পাতা কতটা নড়ছে। জোরে নড়লে বায়ু জোরে বইছে আর আস্তে নড়লে বায়ু আস্তে বইছে। বুঝতে পারো কি বায়ু কোন দিক থেকে বইছে ? তোমরা যা দেখছো তা লিখ।
- বাইরে তাকিয়ে দেখ বৃষ্টি পড়ছে কিনা ? বৃষ্টি পড়লে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে? মুষলধারে না ঝিরি ঝিরি ? তোমাদের খাতায় আঁকা ছকে লিখ।

তোমাদের ছকটির সবগুলো ঘর পূরণ হয়ে গেলে ছকটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর। বোঝার চেষ্টা কর আবহাওয়া একই আছে না পরিবর্তন হয়েছে ? পরিবর্তন হলে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ?

আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ

একটু আগেই জেনেছো যে আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে। কোনো সকালে হয়তো দেখ তেমন গরম নেই। দুপুরে বেশ গরম পড়ছে। কেন এভাবে আবহাওয়া বদলে গেল ? আবহাওয়া পরিবর্তন বা বদলের অনেক কারণ রয়েছে। তবে এ পরিবর্তনের প্রধান কারণ সূর্যের তাপ। রাতে কম গরম পড়ে কারণ তখন সূর্য তাপ দেয় না। দুপুরবেলা বেশ গরম পড়ে। কেন ? কারণ তখন সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে কিরণ দেয়। সূর্য কিরণের সাথে তাপ আসে। সেই তাপ বাতাস, মাটি, ঘরবাড়ি ও পানিকে গরম করে। তাই দুপুরবেলা বেশ গরম পড়ে।

কখনও আমরা দেখি দুপুরের গরমটা ভ্যাপসা গরম। আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। অনেক ঘাম হচ্ছে। বিকেলে অনেক বৃষ্টি হলো। কীভাবে মেঘ হলো ? কীভাবে বৃষ্টি হলো ? মেঘ ও বৃষ্টি কীভাবে তৈরি হলো তা বোঝার জন্য তোমার শিক্ষককে নিয়ে নিচের কাজটি কর।

- তোমাদের শ্রেণির তিনজন মিলে কাজটি কর। অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। একটি পানির কেতলির অর্ধেকটা ভরে পানি নাও। ঢাকনাসহ কেতলিটিকে চুলার ওপরে বসাও।
- আগুন জ্বেলে তাপ দাও। একটু দূরে দাড়িয়ে দেখ কী ঘটছে ? দেখবে কেতলির নল দিয়ে ধোঁয়ার মতো বেরোচ্ছে। ভালোভাবে খেয়াল কর। নলের মুখে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে একটু দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

- এবার চিন্তা করতো ধোঁয়া কোথা থেকে কীভাবে এলো? সহপাঠীরা মিলে আলোচনা করে উত্তর খোঁজ। তোমাদের উত্তর শিক্ষককে জানাও।

কেতলিতে ধোঁয়া উড়ছে।

ধোঁয়া এসেছে কেতলির পানি থেকে। পানিকে তাপ দেওয়ায় পানি বাষ্প হয়ে কেতলীর নল দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাইরে এসে বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে ছোট ছোট পানির কণা হয়েছে। সেই পানিকণাগুলোকে ধোঁয়ার মতো দেখা গেছে।

- এবার ধোঁয়ার উপরে একটা প্লেট ধরো।
- দেখ প্লেটের গায়ে কিছু জমেছে কিনা?

দেখবে প্লেটের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি জমেছে। কীভাবে পানি জমলো? ধোঁয়ার পানিকণাগুলো একসাথে হয়ে বড় হয়ে পানির ফোঁটা হয়েছে। এবার মনে করতো আকাশে মেঘ দেখতে কেমন? ধোঁয়ার মতো? কখনও সাদা ধোঁয়ার মতো আর কখনো বা কালো ধোঁয়ার মতো। কেতলির ধোঁয়ার মতো মেঘও পানি থেকে এসেছে। পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সাগরের পানি সূর্যতাপে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়। আকাশে তা ঠাণ্ডা হয়ে ছোট ছোট পানি কণায় পরিণত হয়। ছোট ছোট পানিকণা আকাশে ভেসে বেড়ায়। এটাই মেঘ। ছোট ছোট পানিকণা একসাথে হয়ে বড় পানিকণা হয়। বড় পানিকণা আকাশে ভেসে থাকতে পারে না। ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে নিচে নেমে আসে। এটিই বৃষ্টি।

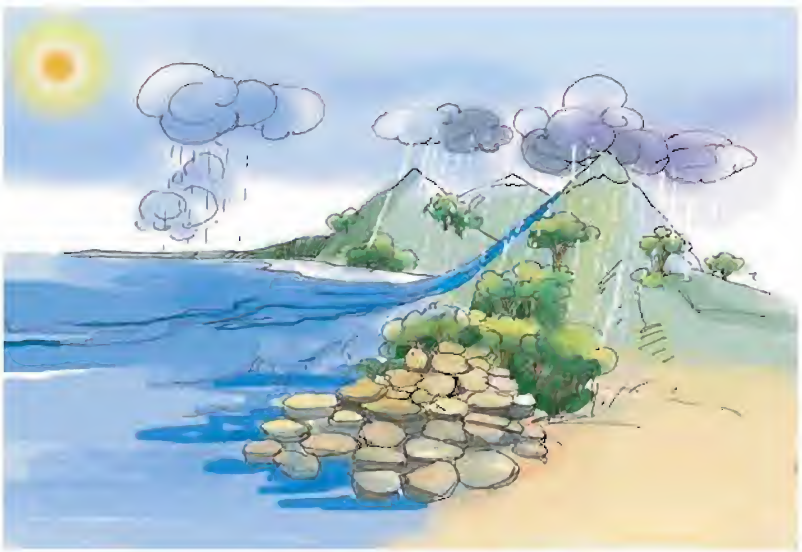

পানি থেকে মেঘ ও বৃষ্টির চিত্র

শীতের সকালে শিশির দেখেছ ? ঘাসের উপরে বিন্দু বিন্দু জল। কেউ ঘাসের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছে ? বৃষ্টি হয়েছে ? না, কেউ পানি ছিটায়নি। বৃষ্টি হয়নি। আসলে শিশির পড়েছে। শিশির কীভাবে হয় ? বৃষ্টির মতো করেই শিশির তৈরি হয়। দিনের বেলা পুকুর, খাল-বিল, নদী থেকে পানি বাষ্প হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। শীতের রাতে বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে পানির কণা হয়ে নিচে নেমে আসে। এই পানির কণাগুলোকে আমরা শিশির হিসেবে দেখি।

আমাদের জীবনে আবহাওয়া

আবহাওয়া নানাভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। শীত পড়লে আমরা গরম কাপড় পড়ি। বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা নিয়ে বাইরে যাই। গরম পড়লে হাতপাখা ও বৈদ্যুতিক পাখা দিয়ে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখি। এবার ভাব, রোদ, বৃষ্টি এগুলো আমাদের জীবনে দরকার আছে কি ? শীত কি দরকার আছে ? তোমরা কি খেয়াল করেছ, শীতের সময় কিছু শাকসবজি ভালো জন্মে? অন্য সময়ে এগুলো ভালো হয় না। আবার বৃষ্টি হয় বলে আমরা নানা ফসল ফলাতে পারি। তাই আবহাওয়ার সকল উপাদান আমাদের জন্য দরকার।

আবার তোমরা ভাবতো, সবরকম আবহাওয়া কি আমাদের জন্য সুফল নিয়ে আসে ? চিন্তা কর, একমাস ধরে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কী হবে ? বাড়ীর আশেপাশে পানি জমে যাবে। রাস্তাঘাট ডুবে যাবে। তোমরা বিদ্যালয়ে যেতে পারবে না। ফসল পানিতে তলিয়ে যাবে। ঘরবাড়িও পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। আমরা এরকম অবস্থাকে বন্যা বলি। বন্যা আমাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশি। একইভাবে, বায়ুপ্রবাহ আমাদের দরকার। কিন্তু ঝড় আমাদের জন্য বিপদ নিয়ে আসে। এভাবে বিরূপ আবহাওয়া আমাদের জীবনে সমস্যা নিয়ে আসে।

জলবায়ু

আমরা দেখি সকালে আবহাওয়া ভালো ছিল কিন্তু দুপরে আবহাওয়া খারাপ। বৃষ্টি আর ঝড় হচ্ছে। তাই আবহাওয়া হলো কোনো জায়গার অল্প সময়ের অবস্থা। জলবায়ু হলো কোন স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি গড় অবস্থা। যেমন আমরা দেখি বাংলাদেশে তিনমাসের মতো সময় শীত পড়ে। বছরের বাকি সময়টা গরম পড়ে। তিনমাস বেশ বৃষ্টি হয়। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা-মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের গড় আবহাওয়া একই রকম। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ বা গরম এবং ভেজা বা আর্দ্র।

রাশিয়া নামের দেশের কথা শুনেছ? আমাদের দেশের অনেক উত্তরে এ দেশটি। এখানে বছরের বেশির ভাগ সময় খুব ঠাণ্ডা। এতটাই ঠাণ্ডা যে, পুকুরের পানি জমে বরফ হয়ে যায়। রাশিয়ার জলবায়ুকে আমরা শীতল জলবায়ু বলতে পারি।

বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?

খেয়াল কর, বাংলাদেশে দুই-তিন মাস শীত পড়ে। তারপরও বাংলাদেশের জলবায়ুকে কেন গরম বলা হয়? কারণ, জলবায়ু হলো দীর্ঘ সময়ের সামগ্রিক ফল। আবার রাশিয়ায় কয়েকমাস গরম পড়ে। তারপরও ওখানকার জলবায়ুকে শীতল বলা হয়। কারণ মোটের ওপর ওখানকার জলবায়ু শীতল।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. কোনো জায়গার দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার সামগ্রিক অবস্থা হলো ————।
খ. মেঘের পানির কণা অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে ———— হয়।
গ. বাংলাদেশে ———— কালে কুয়াশা পড়ে।
ঘ. ভালো ফসল ফলাতে ————প্রয়োজন।
ঙ. অনেক বৃষ্টি ———— কারণ হতে পারে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

ক. কোনটি আবহাওয়ার উপাদান ?
১) চাঁদ ২) সূর্য
৩) তারা ৪) রোদ

খ. নরওয়ে নামের একটি দেশে বছরে নয় মাস শীত পড়ে। ঐ দেশের জলবায়ুকে কী বলা যায় ?
১) উষ্ণ ২) শীতল
৩) ভেজা ৪) গরম

গ. আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রধান কারণ কী ?
১) বৃষ্টি ২) বাতাস
৩) সূর্যের তাপ ৪) মেঘ

ঘ. মেঘ হয় কোনটি থেকে ?
১) বাতাস থেকে ২) রোদ থেকে
৩) সূর্যের তাপ থেকে ৪) পানির বাষ্প থেকে

ঙ. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন ?

১) শীতল ২) উষ্ণ ও আর্দ্র

৩) মরুদেশীয় ৪) মেরুদেশীয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. আবহাওয়ার উপাদানগুলোর নাম লিখ।

খ. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন ?

গ. মেঘ কী ?

ঘ. বেশি বৃষ্টি হলে কী সমস্যা হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. আবহাওয়া বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা কর।

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী ?

গ. শিশির কীভাবে হয় তা লিখ।

ঘ. পানি থেকে কীভাবে মেঘ এবং মেঘ থেকে কীভাবে বৃষ্টি হয় তা চিত্র এঁকে দেখাও।

নিজে নিজে কর

বাড়িতে রেডিও বা টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবর শোন। খবর থেকে আবহাওয়ার উপাদানগুলো চিহ্নিত করে লিখ।

অধ্যায়–১১

জীবনের নিরাপত্তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

দুর্ঘটনা ও জীবনের নিরাপত্তা বলতে আমরা কী বুঝি?

বাড়িতে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ কর, বাবা-মা ছোটদের চলাচল, খেলাধুলা, গোসল ইত্যাদিতে যত্ন নিয়ে থাকেন। তোমাকেও নিশ্চয়ই স্কুলে যাতায়াত, খেলাধুলা ও অন্যান্য কাজে সাবধান হতে বলেন। বিশেষ করে আগুন, বিদ্যুৎ, দা-বটি, চাকু ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এ সাবধানতার মূল উদ্দেশ্য কী ? নিশ্চয়ই ঘরে-বাইরে, সবক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাতে কেউ কোনো প্রকার দুর্ঘটনায় শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

দুর্ঘটনার নানা চিত্র

খবরের কাগজ, রেডিও ও টেলিভিশনে আমরা প্রায়ই নানারকম দুর্ঘটনা ঘটার খবর পেয়ে থাকি। বাড়ি-ঘর, শিল্প-কারখানা, হাট-বাজার ও হাসপাতালে আগুন লাগায় অনেক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়। আবার রাস্তায় চলাচলে সাইকেল, রিক্সা, বাস ইত্যাদির দুর্ঘটনায়ও যানবাহন নষ্ট হয়। চলাচলকারী মানুষেরও নানারকম ক্ষতি হয়। খেলাধুলা, সাঁতার কাটা ও স্কুলে যাতায়াত ও রাস্তায় চলাচলে দুর্ঘটনা ঘটে। আবার বাড়ির আঙিনা, বাগান ও বন্য এলাকায় চলাচলের সময় সাপে কাটতেও পারে।

তা হলে দুর্ঘটনা কী?

মানুষসহ যে কোন জীব বা জড় বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার আকস্মিক ধ্বংস বা ক্ষতি হওয়াই দুর্ঘটনা। তবে সাইকেল, গাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নষ্ট হলে তা মেরামতের বা নতুনভাবে পাওয়ার উপায় আছে। কিন্তু মানুষের শারীরিক ক্ষতি হলে বা মৃত্যু ঘটলে তা কি নতুন ভাবে পাওয়ার উপায় আছে? নিশ্চয়ই নাই। তবে জীবিতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। দ্রুত চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল হয়। এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় আছে কি ? নিশ্চয়ই আছে। তা হচ্ছে, সব কিছুতে সতর্ক থাকা।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়

আমরা জেনেছি, নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তবে দুর্ঘটনা রোধের নানা উপায়ও আছে। কৌশলের ব্যবহার খুব প্রয়োজন। তবে নিরাপদ থাকার সফলতা বেশি নির্ভর করে সতর্কভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলার ওপর। যেমন– বাড়ি ও স্কুলের বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে, জ্বালানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সব রকম সতর্কতা পালন প্রয়োজন। এ সব ব্যবহারের যন্ত্রপাতি ত্রুটিমুক্ত রাখতে হবে। সতর্কতার অভাবেই শরীরের কোন অংশ পোড়া, পানিতে ডোবা, সাপে কাটা ইত্যাদি বিপদ ঘটে থাকে।

পানিতে ডোবা প্রতিরোধ

আমাদের দেশে ছোট বড় সকলে গোসল ও সাঁতার কাটা পছন্দ করি। এতে শরীর সতেজ লাগে। তোমরাও নিশ্চয়ই পুকুরে গোসল করে মজা পাও। অনেক শিশু নদী-নালার পানিতে গোসল ও সাঁতার কাটতে বেশি আনন্দ পায়। তবে এসব আনন্দের সঙ্গে বিপদও আছে। তাই প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে পানিতে ডোবার খবর শোনা যায়। আমাদের সকলকে এসব দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে।

এবারে ভাবতো, পানিতে ডোবার দুর্ঘটনারোধে তোমাদের কিছু করার আছে কি?

পানিতে ডোবা

নিশ্চয়ই আছে। আমরা এ রকম দুর্ঘটনা প্রতিরোধের যেসব নিয়ম আছে তা পালন করব। যেমন আমরা সাঁতার কাটা শিখব, বড়দের ছাড়া একাকী সাঁতার কাটব না। সাঁতার না শেখা পর্যন্ত পানিতে নামব না। পানিতে লুকোচুরি খেলব না। এছাড়া গোসল ও সাঁতার কাটার সময়ে অন্যান্যদের প্রতিও লক্ষ রাখব।

গায়ে আগুন লাগার প্রতিরোধ

আমাদের অনেক বাড়িঘরে, কারখানায় ও স্কুলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। এছাড়া বহু আগে থেকেই জ্বালানি কাঠের আগুন, কেরোসিনের ল্যাম্প, চুলা, স্টোভ ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে। আবার অনেক কাজে মোমবাতিও ব্যবহার করা হয়। অথচ এগুলো থেকে মানুষের আগুনে পোড়ার দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আবার বড় ধরনের আগুনে ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদও ধ্বংস হয়ে থাকে। এতে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পোড়া বা মৃত্যুও ঘটে থাকে। তোমাদের কেউ হয়তো এসব দেখেও থাকবে।

ঘর বাড়িতে আগুন লাগা

আগুনে পোড়ার দুর্ঘটনা ঘটার মূল কারণ কী ?

নিশ্চয়ই বলবে এর মূল কারণ হচ্ছে অসাবধানতা। অনেক শিশু ম্যাচ, মোমবাতি, চুলা, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। এভাবে শিশুরা দুর্ঘটনায় আহত হয়। আবার কখনো শিশুদের কারণে বড় ধরনের আগুনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তবে জ্বলন্ত বিড়ি, সিগারেট ও ম্যাচের কাঠি যেখানে সেখানে ছুড়ে ফেলায়ও আগুন ছড়ায়।

এবারে ভাবতো, আগুনে পোড়ার দুর্ঘটনা রোধে তোমরা কী করতে পার ?

আগুন ধরার যন্ত্রপাতি যেমন চুলা, ম্যাচ, বিদ্যুতের তার না ধরা। লক্ষ রাখতে হবে, সাবধানতা ও সতর্ক আচরণ শুধু শেখার বিষয় নয়। এগুলো হলো সব সময় আগুন নিয়ে না খেলা এবং আগুন থেকে নিরাপদ দূরে থাকা। ভেজা হাত দিয়ে বৈদ্যুতিক তার ধরা উচিত নয়। বৈদ্যুতিক প্লাগে কিছু না ঢোকান। ঢিলেঢালা কাপড় পরে আগুনের কাছে না যাওয়া। আগুনের কাছে শুকনো কাগজ, কাঠ ও কাপড় না নেয়া। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়লে, তা ধুলাবালি বা পানি দিয়ে নিভাতে হবে।

তবে কেউ আগুনে পুড়তে থাকলে তাকে গায়ের আগুন নেভানোর জন্য মাটিতে গড়াতে হবে। অথবা হাতের কাছে থাকা মোটা চট বা বস্তা, কাঁথা, কম্বল বা লেপ দিয়ে তাকে জড়িয়ে আগুন নেভাতে হবে।

সাপে কাটা

তোমরা কি সাপে কাটার কোনো দুর্ঘটনা ঘটার বর্ণনা শুনেছ? আমাদের দেশে সাধারণত গ্রামাঞ্চলে মানুষকে বেশি সাপে কাটে। সাপে কাটলে বিষ দ্রুত রক্তে মিশে দেহে ছড়িয়ে পরে। তাই এর চিকিৎসার সময় ও সুযোগ পাওয়া যায় না। ফলে অনেকের মৃত্যু ঘটে। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারলে যেমন– হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য পেলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচানো যায়।

সাপে কাটা

সাপে কাটা রোধ করতে হলে আমাদের কী করতে হবে?

প্রথমেই সাপের আবাসস্থল ও সাপের আচরণ সম্বন্ধে জানতে হবে। সাপ বন-জঙ্গল ছাড়াও বাড়ি-ঘরের আশে-পাশে থাকে। বিশেষ করে, যেখানে ব্যাঙ ও ইঁদুর বেশি থাকে। সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর ও পোকা-মাকড় খায়। ইঁদুরের করা গর্তে এরা বাস করে।

সাপে কাটা রোধে বাড়ির আঙিনা এবং বন-বাগানে চলাচলে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্ধকারে হাটা বন্ধ করতে হবে। রাতে পায়ে চলার সময় অবশ্যই টর্চ লাইট বা অন্য বাতি ব্যবহার করতে হবে। কাঁচা ঘরের গর্তে সাপ থাকলে তাতে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে দিলে সাপ গর্ত থেকে বের হয়ে যায়। এ ছাড়া কার্বলিক এসিড ও ফিনাইল দিলেও সাপ বেরিয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা কী ও কেন?

আমরা জেনেছি, মানুষ নানাভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। যেমন–পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। এসব ক্ষেত্রে জীবিতদের জন্য মূল করণীয় হচ্ছে চিকিৎসা। দ্রুত চিকিৎসায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল হয় এবং রোগীকে বাঁচানো যায়। ধর তোমাদের কোনো বন্ধু দুর্ঘনায় পড়েছে। কিন্তু কাছাকাছি কোন হাসপাতাল নেই। তাই তাকে নিকটতম চিকিৎসা কেন্দ্রে নিতে অনেক সময় লাগবে। দীর্ঘ সময়ে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে রোগীর আরও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এমনকি মারাও যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কী সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? নিশ্চয়ই বলবে, নিজেদেরই প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলে স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া ভালো।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কী কী প্রস্তুতি ও আয়োজন প্রয়োজন?

প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে রোগীকে প্রাণে বাঁচানোর দ্রুত সাময়িক ব্যবস্থা করা। তোমরা জান, ডায়রিয়ার জন্য বাড়িতে সাধারণত কী রাখা হয়? খাবার স্যালাইন। তাহলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তোমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে? দুর্ঘটনার ধরণ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন– তুলা, ব্যান্ডেজ, কাঁচি ইত্যাদি প্রয়োজন। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসাবে কী ব্যবস্থা থাকতে হবে ? 'প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স' বা 'ফার্স্ট এইড বক্স'। যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী মজুদ থাকে। এগুলো দিয়ে রোগীকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

'ফার্স্ট এইড বক্স' সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী

পানিতে ডোবা ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা

তোমরা নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে পানিতে সাঁতার কাটা বা লঞ্চ-স্টিমার দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে থাক। পানিতে ডোবা ব্যক্তিকে দ্রুত উদ্ধার ও তাৎক্ষনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে বাঁচানো সম্ভব। শিশু হলে, পানি থেকে তোলার পর তার পায়ের গোড়ালি উপরে ধরে কয়েক মিনিট ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এতে সে যে পানি গিলেছে তা বেড়িয়ে আসবে। আস্তে আস্তে পিঠে থাপড় দিতে হবে। মুখে কোনো খাবার বা অন্য কিছু থাকলে তাও বের হয়ে আসবে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমত দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তা হচ্ছে রোগীর জ্ঞান আছে কি না অথবা শ্বাস নিচ্ছে কি না।

পানিতে ডোবা শিশুকে উদ্ধার ও তাৎক্ষণিক করণীয়

যদি দেখা যায় যে রোগী শ্বাস নিচ্ছে না তখন দ্রুত রোগীর মাথা বুক থেকে উঁচুতে ধরতে হবে। তারপর প্রতি আধ মিনিট পর পর মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে হবে। তবে এর পূর্বে মুখে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। মাঝে মাঝে রোগীকে শ্বাস ছাড়ার জন্য সময় দিতে হবে। এছাড়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দেয়া

আর যদি রোগীর জ্ঞান থাকে তবে সরাসরি ডাঙায় তুলতে হবে। দ্রুত জামা-কাপড় খুলে ফেলতে হবে। তারপর নাক ও মুখের পানি মুছিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীর মাথা একটি হাতের উপর কাত করে রাখতে হবে। মুখ ও গলার ভিতরে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দুই মাড়ির মাঝে শক্ত কিছু দিয়ে জিহ্বা টেনে একদিকে বের করে মুখ খোলা রাখতে হবে। রোগীর পেটের নিচে ছোট বালিশ বা কাপড়ের পোটলা দিতে হবে।

ডাঙায় উপুড় করে পিঠে চাপ দিয়ে পানি বের করা

তারপর চিত্র অনুযায়ী তোমার পা রোগীর পায়ের দুপাশে রেখে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বস। তারপর পিঠের নিচের দিকে দুপাশে হাত রেখে কিছুক্ষণ পর পর চাপ দিতে থাক। কয়েকবার চাপ দিলেই পেট থেকে পানি বেরিয়ে আসবে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হবে। এ অবস্থায় রোগীকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

আগুনে পোড়ার রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা

শরীরের কোন অংশ পুড়ে গিয়ে থাকলে তা কতটা গুরুতর প্রথমে তা যাচাই করতে হবে। তারপর পোড়া কম-বেশি অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। পোড়া যদি কম হয়, যেমন শুধু ছ্যাঁকা লাগা বা জ্বালা করলেও তা শুধু চামড়ার উপরের অংশের ক্ষতি করে। এ রকম অবস্থায় পোড়া স্থানটি অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তবে কোনো স্থান যদি বেশি পুড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঐ স্থানে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা

তবে ফোস্কা গলে গিয়ে থাকলে, পানিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ডেটল, স্যাভলন গুলিয়ে পোড়া স্থান পরিষ্কার করতে হবে। এজন্য পরিষ্কার পুরাতন পাতলা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। তবে ব্যাথা বা জ্বর থাকলে বা ফুলে উঠলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

সামান্য পোড়ায় বার্নল বা পানি নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপকার হয়। ফোস্কা পড়লে তা ভাঙবে না।

সাপে কাটা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা

আমাদের দেশে সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে সাপে কাটার দুর্ঘটনা বাড়ে। কখনো তোমরা নিশ্চয়ই গোখরা ও কেউটে সাপের নাম শুনেছ। এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিষধর সাপ।

কোন সাপ বিষধর তা কীভাবে চেনা যায়?

এদের সামনের উপরের চোয়ালে দুটি বিষ দাঁত থাকে। এ ধরনের সাপের কামড়ে সৃষ্ট ক্ষত দেখে তা বোঝা যায়। ক্ষত স্থানে দুটি দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা গেলে বুঝা যায় যে এটা বিষধর সাপের কামড়। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সাপে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন। জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপে কাটার ক্ষেত্রে প্রথমেই হাত, পা বা অন্য অঙ্গের কাটা স্থানের একটু উপরে দড়ি বা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে। যাতে সাপের বিষ সহজে রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

এর পর কাটা স্থানটি ভালভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে হবে। ক্ষতস্থানে দাঁতের দাগ স্পষ্ট দেখা গেলে বুঝতে হবে যে সাপটি বিষধর ছিল। এক্ষেত্রে মরিচামুক্ত ছুরি, কাঁচি বা ব্লেড গরম পানিতে ফুটিয়ে, ডেটল দিয়ে মুছে বা আগুনে পুড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করে ঠাণ্ডা করতে হবে। তারপর বড়দের দ্বারা ক্ষতস্থানটি সামান্য কেটে চেপে রক্ত বের করে ফেলতে হবে। এভাবে রক্তের সঙ্গে কিছু বিষ বেরিয়ে যাবে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে।

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে, ওঝারা সাপে কামড়ালে রোগীর ক্ষতস্থান থেকে বিষ নামাতে পারে। আসলে তা ঠিক নয়। এভাবে কখনও বিষ নামানো যায় না।এটা একটি কুসংস্কার।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা

তোমরা নিশ্চয়ই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো দেখেছ। এর ফলে মানুষ ও পশু-পাখির মৃত্যুর খবরও শুনে থাকবে। বিদ্যুতের দ্বারা আহত হওয়াকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বলা হয়। বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে কোনো বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে থাকে। এভাবে বিদ্যুতায়িত তার বা বস্তুর সংস্পর্শে এলে মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যেতে পারে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে ছাড়ানো

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষকে বিদ্যুতায়িত বস্তু থেকে দ্রুত আলাদা করতে হবে। দেরি হলে বাঁচার সম্ভাবনা কমে যাবে। এজন্য নিচের কাজগুলো করতে হবে:

(১) প্রথমেই বিদ্যুৎ সরবরাহের মেইন বা প্রধান সুইচ বন্ধ করতে হবে।
(২) মেইন সুইচ বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষকে ধাক্কা দিতে হবে। যাতে মানুষটি বিদ্যুতায়িত বস্তু বা তারের স্পর্শ থেকে একবারে আলাদা হয়ে যায়।

কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

মেইন সুইচ বন্ধ করা

(১) কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে, তাকে কোন ভাবেই ধরা বা স্পর্শ করা যাবে না। কারণ মানুষের দেহ বিদ্যুৎ পরিবাহী। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষকে স্পর্শ করলে, সেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়বে।

(২) ভেজা কাঠ বা বাঁশের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে। কিন্তু শুকনো কাঠ বা বাঁশ বিদ্যুৎ বহন করে না। তাই বিদ্যুতায়িত বস্তু থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষকে আলাদা করতে শুকনো কাঠ বা বাঁশ ব্যবহার করতে হবে।

(৩) বেশিরভাগ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনমতো কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তার ডাকতে হবে। নতুবা রোগীকে হাসাপাতালে নিতে হবে।

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ

ক. সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার একটি উপায় হচ্ছে ——— উপরে শক্ত করে বাঁধা।

খ. বাড়িতে বাবা-মা ছোটদের সব কাজে——— রোধে সতর্ক করে থাকেন।

গ. ইঁদুরের করা গর্তেই——— বাস করে।

ঘ. কেউ ——— হলে তাকে ধরা বা স্পর্শ করা যাবে না।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

ক. কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে সর্বপ্রথম কী করতে হবে?

১) কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা

২) আহত ব্যক্তিকে স্পর্শ না করা

৩) বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করা

৪) শুকনো কাঠ দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টকে আলাদা করা

খ. পুকুরে বা নদীতে গোসল করার আগে কী করা উচিৎ?
১) কী কী বিপদ হতে পারে তা জানা
২) দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় জানা
৩) কীভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা শেখা
৪) সব রকমের সতর্কতা পালন সম্বন্ধে জানা

গ. গায়ের আগুন নিভাতে রোগীর কী করা উচিৎ?
১) গায়ে পানি ঢালা
২) মোটা কাপড় দিয়ে গা ঢাকা
৩) দৌড় দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া
৪) গায়ে ধুলাবালি ছিটানো

ঘ. পানিতে ডোবা রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কী করতে হবে?
১) ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা
২) শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করা
৩) দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতলে নিতে হবে
৪) প্রয়োজনমতো খাবারের ব্যবস্থা করা

ঙ. দুর্ঘটনা রোধে কোনটি বেশি প্রয়োজন ?
১) সচেতন ও সতর্ক হওয়া
২) ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা
৩) রাস্তার নিয়ম কানুন মেনে না চলা
৪) ঘর থেকে রাস্তায় বের না হওয়া

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশ মিল কর।

বাম	ডান
ক. সাপে কাটা স্থানটি একটু কাটা	ক. দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া
খ. পানিতে ডোবা রোগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন	খ. মেইন সুইচ বন্ধ করা
গ. বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা এড়িয়ে চলার জন্য	গ. শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা
ঘ. দুর্ঘটনা মোকাবেলায় খুব প্রয়োজন	ঘ. সতর্কতা অবলম্বন করা
ঙ. প্রাথমিক চিকিৎসার পরের জরুরি কাজ	ঙ. রক্তের সঙ্গে কিছু বিষ বেরিয়ে যায়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝ ?
খ. সাপে কাটার প্রতিরোধে কী কী করতে হবে ?
গ. রাস্তায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধের দুটি উপায় লিখ।
ঘ. পানিতে ডোবা প্রতিরোধে কী কী করা উচিত ?
ঙ. আগুনে ফোস্কা পড়লে কী করণীয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. প্রাথমিক চিকিৎসা কী ও কেন ? জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা প্রয়োজন ?
খ. আগুনে পোড়ার দুর্ঘটনা কী ? আগুনে পোড়া রোগীর কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় ?
গ. সাপে কাটায় প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে করা হয় বর্ণনা কর?
ঘ. বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া কী? কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে বিদ্যুৎ লাইন থেকে ছাড়াতে হয় ?
ঙ. পানিতে ডোবা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে ? কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করবে ?

অধ্যায়–১২

আমাদের জীবনে তথ্য

তৃতীয় শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ তথ্য কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং তথ্য কীভাবে আদান প্রদান করা যায়। আমরা বই, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন বা কোনো মানুষের কাছ থেকে তথ্য পাই। কিন্তু ভেবেছ কি তথ্য কীভাবে জোগাড় বা সংগ্রহ করা হয়? এসো এবার একটি কাজ করা যাক।

তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হও। দলে আলোচনা করে ঠিক কর কোন বিষয়ে তোমরা তথ্য সংগ্রহ করবে।

তথ্য সংগ্রহের বিষয়: ১। তোমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী উদ্ভিদ আছে ২। তোমাদের বিদ্যালয়ের আশেপাশে কী কী প্রাণী আছে ৩। তোমাদের শ্রেণির ২০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা ও ওজন ৪। তোমার দলের প্রত্যেক সদস্যের শরীরের তাপমাত্রা কত ৫। বিদেশে/দূরে থাকা তোমার কোন বন্ধুর খবর।

এবার তোমরা ঠিক কর কীভাবে এ তথ্য সংগ্রহ করবে। তোমাদের শিক্ষককে জানাও। শিক্ষক সম্মতি দিলে তোমরা তথ্য সংগ্রহ কর।

তোমরা সব কয়টি দল কি একই ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছ? নিশ্চয়ই না। পর্যবেক্ষণ করে আমরা জানতে পারি কোনো একটি জায়গায় কী কী উদ্ভিদ বা প্রাণী আছে। তোমাদের সহপাঠীদের উচ্চতা, ওজন ও তাপমাত্রা মাপতে হলে কী করতে হবে? ফিতা দিয়ে উচ্চতা মাপতে হবে। যন্ত্র দিয়ে ওজন মাপতে হবে। থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপতে হবে। এভাবে যন্ত্র বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

দূরে বা বিদেশে বন্ধুর খবর নিতে হলে চিঠি লিখতে হবে বা ফোন করতে হবে বা ই-মেইল পাঠাতে হবে।

উপরে যে যে উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কথা বলা হলো, সেখানে কি প্রযুক্তি ব্যবহারের দরকার আছে? উদ্ভিদ বা প্রাণী খুঁজে দেখতে প্রযুক্তি না হলেও চলে। কিন্তু উচ্চতা মাপতে ফিতা, ওজন মাপতে ওজন মাপার যন্ত্র আর তাপমাত্রা মাপতে থার্মোমিটার দরকার হয়েছে। ফিতা, ওজন মাপার যন্ত্র আর থার্মোমিটার প্রযুক্তি। কলের পানিতে আর্সেনিক আছে কি না তা জানতে প্রযুক্তির দরকার। রোগ সম্পর্কে তথ্য জানা যায় বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। কারো পা ভেঙে গেছে কি না তা জানা যায় এক্স-রে দিয়ে ছবি তুলে।

ফিতা দিয়ে উচ্চতা মাপা

এরকম অনেক তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া সংগ্রহ করা যায় না। আবার প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ করে দেয়।

তথ্য কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়?

তোমরা নিজেরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছ। এ তথ্য কি মনে মনে রাখবে? সব তথ্য কি করে তোমরা ঠিকমতো মনে রাখতে পারবে? মানুষ যখন লিখতে ও পড়তে পারতো না তখন বিভিন্ন তথ্য মনে রাখতো। একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ তথ্য জেনে নিত। এভাবে তথ্য একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যেতে যেতে তথ্য ঠিক থাকতো না। তখন মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি এঁকে তথ্য রাখতো। তারপর যখন মানুষ লিখতে শিখলো তখন থেকে গুহার দেয়ালে, গাছের ছালে ও পাতায় লিখে তথ্য সংরক্ষণ করতো।

বর্তমান সময়ে তথ্য সংরক্ষণ করার অনেক ভালো উপায় আছে। তুমি কাগজে লিখে বা ছাপিয়ে তথ্য সংরক্ষণ করতে পার। লেখা বা ছাপানো কাগজ বাঁধাই করে রেখে দিতে পার। টেপ রেকর্ডারে কথা রেকর্ড করার মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করতে পার। সিডি দেখেছ তোমরা। এতে গান রেকর্ড করা থাকে, তাই না? সিডিতেও তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে, ভিডিও করেও তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কম্পিউটারে টাইপ করে ও স্ক্যান করে তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কম্পিউটারে রেকর্ড, ভিডিও, ছবি এগুলোও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। পেন ড্রাইভ, সিডি, ভিসিডি এগুলোর মধ্যেও অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। মোবাইলেও তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকে। যেমন মোবাইলে অনেক মানুষের মোবাইল নম্বর ধারণ করে রাখা যায়।

তথ্য ব্যবহার করা

আমরা কেন তথ্য সংগ্রহ করি? তথ্য ব্যবহার না করতে পারলে সংগ্রহ করে লাভ কী? তথ্য সংগ্রহ করে আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করি। তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিচের কাজটিতে বোঝা যাবে কীভাবে তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা যায়।

অনুসন্ধান: তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার

আমরা জানি মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। কারো শরীরের তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে আমরা বলি জ্বর হয়েছে। তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর বেশি হলে তাকে ঔষধ খাওয়ান দরকার। কোন শ্রেণির পাঁচজনের শরীরের তাপমাত্রা মেপে নিচের তথ্য পাওয়া গেল।

শিক্ষার্থী	শরীরের তাপমাত্রা
রেজা মিয়া	৯৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট
চন্দনা রায়	৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট
পবন দাস	১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট
কোরি খীসা	৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট
ফরিদা আখতার	১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট

উপরের ছক থেকে বের কর কার কার জ্বর হয়েছে? কাকে ঔষধ খাওয়ানো জরুরি? এভাবে তথ্য জানার পর আমরা তথ্য ব্যবহার করি। থার্মোমিটার দিয়ে মেপে আমরা একটি তথ্য পাই। সেটি হলো শরীরের তাপমাত্রা কত? সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত নেই জ্বর হয়েছে কিনা?

তথ্যের বিনিময়

তোমরা থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখলে ফরিদার খুব জ্বর। ওকে তাড়াতাড়ি ঔষধ খাওয়ানো দরকার। ওর বিশ্রামও দরকার। তোমরা কীভাবে ওর বাবা–মাকে ওর জ্বরের খবর দিবে?

তোমরা তৃতীয় শ্রেণির বইয়ে তথ্য পাঠানোর উপায়গুলো পড়েছ। আগের দিনের মানুষ ধোঁয়া তৈরি করে দূরের মানুষকে খবর জানাত। পায়ে হেঁটে, নৌকায় চড়ে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে, ঢোল পিটিয়ে, শিঙা ফুঁকে খবর জানাত। কখনও কবুতরের পায়ে বেঁধে চিঠি পাঠান হতো। এরপর তথ্য বিনিময়ের জন্য ডাকব্যবস্থা চালু হয়। আমরা এখনও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করি।

তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন হয় টেলিগ্রাফ উদ্ভাবনের পরে। স্যামুয়েল মোর্স নামে একজন বিজ্ঞানী ১৮৩৭ সালে তারের মধ্য দিয়ে সংকেত পাঠাতে পারলেন। ফলে তারের মধ্য দিয়ে শত শত কিলোমিটার দূরে মানুষ তথ্য পাঠাতে সক্ষম হলো। এটাই টেলিগ্রাফ।

টেলিগ্রাফের পর উদ্ভাবন হয় টেলিফোনের। মানুষ তারের মধ্য দিয়ে দূরের মানুষের সাথে কথা বলতে পারল। এর ফলে তথ্য আদান প্রদান আরও সহজ হয়ে গেল। কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে গেল। টেলিফোনে কথা বলতে তার দরকার হয়। টেলিফোনের তার তা সবসময় সাথে করে নিয়ে যাওয়া যায় না! তাই কেউ বাড়ির বাইরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে পারত না। এ সমস্যারও সমাধান হলো তারবিহীন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ফলে। বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ইতালির বিজ্ঞানী মার্কনি প্রায় একই সময়ে এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবিত হলো বেতার বা ওয়ারলেস।

রেডিও

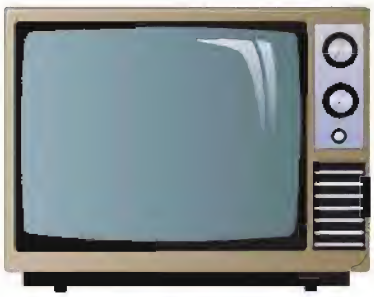

টেলিভিশন

কম্পিউটার

তারবিহীন প্রযুক্তি তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরেকটি বিপ্লব নিয়ে আসে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেই রেডিও উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে টেলিভিশন। মোবাইলও একই পদ্ধতিতে কাজ করে। রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তথ্যকে তার ছাড়াও মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে। তবে রেডিও বা টেলিভিশন থেকে আমরা কেবল তথ্য পাই। আমরা কোনো তথ্য দিতে পারি না।

মোবাইলের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলে তথ্য বিনিময় করতে পারি। ছোট চিঠি বা মেসেজের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করতে পারি। আজকাল মোবাইলের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেটের বুকিং দেয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা হয়। ব্যাংকের কিছু কাজও করা যায় মোবাইলে। কৃষিসংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তারবিহীন প্রযুক্তির কারণে বর্তমান যুগে তথ্য আদান প্রদান অনেক সহজ ও দ্রুত হয়েছে।

কম্পিউটারে ইন্টারনেট

তোমরা কম্পিউটারের কথা শুনেছ বা দেখেছ? কম্পিউটারে আমরা লিখতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, গান শুনতে পারি, নাটক বা ছায়াছবিও দেখতে পারি। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে আরও প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারি। কম্পিউটারে আমরা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন তোমরা ছবি, গান, লেখা এগুলো সংরক্ষণ করতে পার। এটি দিয়ে আমরা তথ্যকে ব্যবহার উপযোগি করতে পারি। যেমন– তোমরা তোমাদের শ্রেণির সকলের উচ্চতা ও ওজন মাপলে। কম্পিউটারের সাহায্যে তোমরা বের করতে পারবে উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম কার কার। কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য আদান প্রদানও করা যায়। তবে তার জন্য দরকার ইন্টারনেট।

তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হলো সারা পৃথিবীর কম্পিউটারগুলোর একটি জাল বা নেট। এই জালে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়েছে। ফলে একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারে তথ্য সহজেই পাঠিয়ে দেয়া যায়। যেমন তুমি বাংলাদেশের একটি কম্পিউটারে বসে তোমার বিদ্যালয়ের একটি ছবি অস্ট্রেলিয়ার একটি কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিতে পার। সেখানে তোমার

বন্ধু তার কম্পিউটারে সাথে সাথে সেই ছবিটি দেখতে পারবে। তার কম্পিউটারে সেটি সংরক্ষণ করতেও পারবে। অনেক তথ্য বা জ্ঞান ইন্টারনেটে রাখা আছে। তোমার কম্পিউটারে যদি ইন্টারনেটের সংযোগ থাকে তাহলে তুমি সে তথ্য সংগ্রহ করতে পার। যেমন, ইন্টারনেটে দেয়া আছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ট্রেন কখন ছাড়ে। তুমি ইন্টারনেটে গিয়ে তা দেখতে পার। তুমি ইন্টারনেট থেকে ট্রেনের টিকেটও কাটতে পার।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি দেশ-বিদেশের বন্ধুদের সাথে চিঠি বিনিময় করতে পার। বন্ধুদের সাথে কথাও বলতে পার। বড় হয়ে বিদেশে পড়ালেখা বা চাকরির জন্য আবেদন করতে পার। ইন্টানেটের মাধ্যমে দেশে বিদেশে টাকা লেনদেন করা যায়। জিনিসপত্র কেনা যায়। এরকম অনেক কাজই ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যায়। এখন মোবাইলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। তাই ইন্টারনেট তথ্য বিনিময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।

তোমরা এতক্ষণ তথ্য বিনিময়ের বিভিন্ন উপায়ের কথা জানলে। এবার বল, ফরিদার বাবা–মাকে কীভাবে ওর জ্বরের খবর জানাবে? টেলিফোন বা মোবাইল থাকলে ফোন করে জানাতে পার, তাই না। ইন্টারনেট থাকলে তাতেও জানানো যায়। এসব কিছু না থাকলে? নিশ্চয়ই কাউকে পাঠিয়ে খবরটি জানানো যায়।

আমরা এ অধ্যায়ে প্রথমে জানলাম তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যায়। প্রযুক্তি ছাড়াও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে অনেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে প্রযুক্তি দরকার হয়। প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহকে সহজ করে দেয়। আমরা আরও জেনেছি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। তথ্যকে বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা হয়। সবশেষে জানলাম তথ্য বিনিময়ের প্রযুক্তি কীভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে অনেক সহজে ও দ্রুত তথ্য বিনিময় করা যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. পর্যবেক্ষণ করে তথ্য ———— সংগ্রহ করা যায়।
খ. প্রাচীনকালে মানুষ গুহার গায়ে ছবি এঁকে ———— সংরক্ষণ করতো।
গ. সংগ্রহ করা তথ্য ব্যবহারের জন্য তথ্য ———— করতে হয়।
ঙ. ইন্টারনেটে সংরক্ষিত আছে অনেক ———— ।
চ. রেডিও উদ্ভাবনের স্বীকৃতি দেয়া হয় বিজ্ঞানী ————কে।

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

ক. বাঙালি কোন বিজ্ঞানী তারছাড়া তথ্য পাঠানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন?
১) জগদীশ চন্দ্র বস ২) সত্যেন্দ্র নাথ বসু
৩) কুদরত-ই-খুদা ৪) মোতাহার হোসেন

খ. কোনটি তথ্য যোগাযোগে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে?
১) ডাক যোগাযোগ ২) ঘোড়ার গাড়ি
৩) কাগজ ৪) টেলিগ্রাফ

গ. কোন তথ্যটি জানতে প্রযুক্তির প্রয়োজন?
১) সবজির দাম ২) কারো অভিভাবকের নাম
৩) শরীরের তাপমাত্রা ৪) কোনো বাগানে আম গাছের সংখ্যা

ঘ. টেপ রেকর্ডারে বা সিডিতে তুমি একটি গান রেকর্ড করে রাখলে। এটিকে কী বলা যায়?
১) তথ্য সংগ্রহ ২) তথ্য সংরক্ষণ
৩) তথ্য বিশ্লেষণ ৪) তথ্য ব্যবহার

ঙ. তারবিহীন যোগাযোগ প্রযুক্তির উদাহরণ কোনটি?
১) টেলিফোন ২) টেলিগ্রাফ
৩) টেলিভিশন ৪) কম্পিউটার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. ইন্টারনেট কী তা ব্যাখ্যা কর।

খ. ইন্টারনেটকে আমরা কী কী কাজে লাগাতে পারি ?

গ. প্রাচীনকালে তথ্য সংরক্ষণ করা হতো কীভাবে ?

ঘ. টেলিগ্রাফ কীভাবে তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছে ?

ঙ. মোবাইল ফোনে কথা বলা ছাড়াও আর কী ধরনের কাজ করা যায় ?

চ. তোমাকে বলা হলো তোমাদের বাজারে মাছের দাম জানতে। তুমি কোন কোন উপায়ে এই তথ্য সংগ্রহ করতে পার ?

ছ. কম্পিউটারকে কী কী কাজে ব্যবহার করা যায় ?

অধ্যায়–১৩

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমরা সকলেই সুন্দর পরিবেশে জীবন যাপন করতে চাই। এ জন্য দরকার পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ। যাতে থাকবে বন-বাগান, খালবিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। মাটির ওপর ঘরবাড়ি তৈরি করে আমরা বসবাস করি। জমি চাষ করে ফসল ফলাই, যা আমাদের খাদ্য যোগায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকেও আমরা খাদ্যসহ অনেক কিছু পেয়ে থাকি। মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন মাটি, পানি ও বায়ু এবং সূর্যের আলো। আর তার সঙ্গে দরকার বাড়তি ঘরবাড়ি ও বাড়তি খাদ্য। এ ছাড়া দরকার হাটবাজার, কলকারখানা ও মলমূত্র নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা। এতে গাছ-পালা ও পশু-পাখির যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

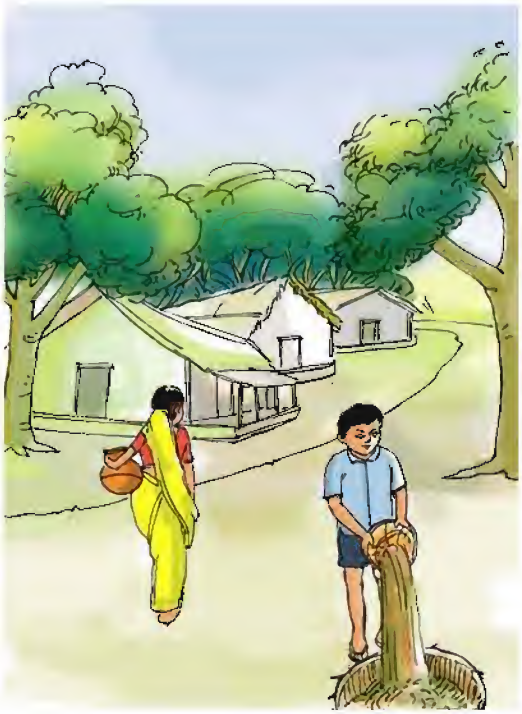

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

উপরের চিত্রে প্রদর্শিত সুন্দর ও আদর্শ পরিবেশ জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়। যেমন– কোনো পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়লে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়? বাড়তি খাবারের

আয়োজন ছাড়াও দরকার বাড়তি থাকার জায়গা। যেমন– বসা, ঘুমান, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদির সমস্যা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার বা দেশের লোকসংখ্যা যদি বাড়ে সেখানে বাড়তি কী কী প্রয়োজন হয় ? প্রথমত বাড়তি খাদ্যের সঙ্গে বাড়তি বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। তাই বাড়তি ঘর-বাড়ি তৈরি হতে থাকে। এভাবে এলাকাটি বা দেশটি শুধু ঘনবসতি পূর্ণ হয় না। এর সঙ্গে বাড়তি লোকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য মৌলিক চাহিদারও ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বাড়তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, হাসপাতাল ইত্যাদি। এ ছাড়াও বাড়াতে হয় যানবাহন, রাস্তাঘাট, পুল, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যেসব পরিবর্তন বা ক্ষতি হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়তি জনসংখ্যার জন্য পরিবেশের পরিবর্তন ও ক্ষতির তালিকা			
ক্রমিক নং	বাড়িতে	বাড়িঘর নির্মাণ	বন–বাগান
১			
২			
৩			
৪			
৫			

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের উপর বাড়তি জনসংখ্যার জরুরি চাহিদার মেটানোর প্রভাব

আমরা জানি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাও বাড়তে থাকে। যেমন খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে খাদ্য সরবরাহ। যেমন– একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই খাদ্য প্রয়োজন হয়। এ জন্য বেশি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্র–ছাত্রী

সময় সংকুলানের কোনো সুযোগ নেই। এর পাশাপাশি বাড়তি বাসস্থান তৈরির চাহিদাও বাড়তে থাকে। এসবের জন্য মানুষকে সাধারণত স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরই নির্ভর করতে হয়। অথচ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন ভূমি, নদী-নালা, বন-বাগান, পশু-পাখি ইত্যাদির পরিমাণ খুব কম। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে এর প্রায় অনেক ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছে।

জনবহুল শহর

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি

সুস্থ-সবল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু বাড়তি লোক সংখ্যার বাড়তি চাহিদার কারণে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

বাড়তি ঘরবাড়ি ও বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের কারণে গাছ-পালা ও ভূমি নষ্ট হচ্ছে। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও বিষাক্ত ওষুধ, মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত করছে।

অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কারণে শিল্প, কারখানা, হাসপাতাল, যানবাহন ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়ছে। এসব থেকে নির্গত বর্জ্য ও মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত করছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি ছোট ও সবচেয় জনবহুল দেশ। এর প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত কম। এই সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সকলকে খুব যত্নশীল হতে হবে।

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ কর

ক. দূষণমুক্ত পরিবেশে বাস করতে চাই দূষণমুক্ত ———— পানি ও বায়ু।
খ. সবচেয়ে ঘনবসতির ক্ষুদ্রতম ———— হলো।
ঙ. একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল ফলালে জমির ———— হ্রাস পায়।

সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও

ক. পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা কত –
১) ৬৭০ কোটি ২) ৭০০ কোটি
৩) ৭১০ কোটি ৪) ৬৫০ কোটি

খ. বাংলাদেশের চাষাবাদ পুরোপুরি আধুনিক করলে–
১) ফলন আরও বাড়বে ২) বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করা যাবে
৩) কর্মসংস্থান বাড়বে ৪) অনেক কৃষি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে

গ. কোন দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়লে খুব জরুরি কিসের চাহিদা বাড়ে?
১) বাসস্থান ২) শিক্ষা
৩) খাদ্য ৪) চিকিৎসা

বাম পাশের অংশের সঙ্গে ডান পাশের অংশের মিল কর

বাম	ডান
ক) সুস্থ সবল জীবনের জন্য প্রয়োজন	ক) মানুষের মৌলিক চাহিদাও বাড়ে।
খ) চীন হচ্ছে	খ) মাটি ও পানি দূষিত করে।
গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে	গ) বাড়তি খাবার ও বাড়তি জায়গা লাগে।
ঘ) শিল্প-কারখানার বর্জ্য	ঘ) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা।
ঙ) পরিবারে লোকসংখ্যা বাড়লে	ঙ) সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।
	চ) পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. বাড়তি জনসংখ্যার কারণে বাড়ি নির্মাণে ও ফসল চাষে বন-বাগানের কী পরিবর্তন ও ক্ষতি হয়– এর একটি তালিকা তৈরি কর।

খ. বাড়তি জনসংখ্যার কারণে বায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, বর্ণনা কর। বায়ু দূষণের কারণ ও কুফলের একটি তালিকা তৈরি কর।

গ. বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতির দেশ, ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. বাড়তি জনসংখ্যা বা ঘনবসতির স্থানে পানি সম্পদের কীরূপ ক্ষতি হয়। বর্ণনাসহ একটি তালিকা তৈরি কর।

খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. বাড়তি ঘরবাড়ি তৈরি ও বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে মাটির কী ক্ষতি হয়? তার বর্ণনাসহ একটি ছক তৈরি কর।

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৪-বি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত— বিক্রয়ের জন্য নয়।